বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

উপেন তরফদার

বেতার সাংবাদিক **উপেন তরফদার** জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার নালী গ্রামে। পদ্মাপাড়ে গ্রামের মাইনর স্কুলের পাঠ শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য কোলকাতায় চলে আসেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক হবার পর তিনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য-বিভাগে ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৮৬ আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রেই কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তিনি উত্তর প্রদেশের নাজিরাবাদে আকাশবাণীর কেন্দ্র অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯১ সালে তিনি কোলকাতা দূরদর্শনের উপ-অধিকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে লেখক কোলকাতা দূরদর্শনের মুখ্য প্রযোজক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে বহুমাত্রিক পরিব্যাপ্তি। বিশ্বজনমত এই মহান মুক্তিযুদ্ধে ছিলো আমাদের সাথে। আকাশবাণী, বিবিসি-সহ বিশ্বের অনেক সংবাদ মাধ্যম এই যুদ্ধে বাস্তবভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনার মাধ্যমে আমাদের উদ্দীপ্ত করে রেখেছিলো। আকাশবাণীর 'সংবাদবিচিত্রা'র প্রযোজক, উপেন তরফদার বিভিন্ন সাক্ষাৎকার-মূলক অনুষ্ঠান আকাশবাণীতে প্রচারের মাধ্যমে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অনেক লোমহর্ষক, সাহসী এবং আশাব্যঞ্জক খবর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছেন হৃদগ্রাহী করে।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা ছাড়াও লেখক তাঁর আকাশবাণীর সাথে দীর্ঘ ৪০ বছরের চাকরি জীবনের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ননা করেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়।

প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার

www.pathagar.com

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

উপেন তরফদার

পরমা

ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
কাওসার পারভীন
পরমা
মমতাজ প্লাজা, বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-৪
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬৬১১৪১-৩
ফ্যাক্স ঃ (৮৮ ০২) ৯৬৬২৮৪৪, ৮৬১০৭৭৪
E-mail : aahcl @ bangla. net

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

বর্ণ বিন্যাস
কসমোপল কম্পিউটারস, ৮ হাটখোলা রোড (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা।

মুদ্রণে
সৃতি প্রিন্টার্স
১৪৫/১ আরামবাগ, ঢাকা ১০০০

পরিবেশক
পপুলার পাবলিশার্স
২০ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫৯২১

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

Bangladesh Amar Bangladesh by Upen Tarafder, Published by Kawsar Parvin, Parama, Momtaz Plaza, Road No. 4, House No. 7, Dhanmondi, Dhaka-1205, Printed by Printing Museum, 30-31 Suklal Das Lane, Sutrapur, Dhaka-1100, First Edition : June 2000, Cover design : Samar Majumder. Price : Tk. 80.00.

ISBN- 984-8245-47-2

www.pathagar.com

আমার কথা

আমি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে যোগদান করি ১৯৫৪ সালে। আর কলকাতা দূরদর্শন থেকে অবসর গ্রহণ করি ১৯৯৪ সালে। দীর্ঘ এই চল্লিশ বছরের চাকরি জীবনে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'সংবাদ বিচিত্রা'র প্রযোজক হিসেবে সৃষ্টিধর্মী কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম প্রায় পঁচিশ বছর। সংবাদ-ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানটির প্রতি শ্রোতাদের আকর্ষণ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমাকে নানা জায়গায় ছুটতে হয়েছে টেপ রেকর্ডার নিয়ে, সাক্ষী হতে হয়েছে অসংখ্য ঘটনার। এর মধ্যে অনেক ঘটনা আনন্দের আবার অনেক বিষাদের। মিলতে হয়েছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে–তার মধ্যে যেমন সাধারণ মানুষও আছেন তেমনি আছেন বরণীয় ব্যক্তিত্ব। শুধু ভারতবর্ষেরই নয় পেশাগত প্রয়োজনেই সারা বিশ্বের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের অনেকের স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য।

বৈচিত্র্যময় সেই কর্মজীবনের অনেক মুহূর্তই ছিল–উত্তেজনা আর রোমাঞ্চে ভরা। অনেক ঘটনাই আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে আবার অনেক ঘটনার ছবি ক্রমশঃই ঝাপসা হয়ে আসছে। তবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমার স্মৃতিতে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। নির্যাতিত-নিপীড়িত বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে একদিন আমি আবিষ্কার করলাম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ওপার বাংলার সংগ্রামী ভাইবোনেদের সঙ্গে আমিও একজন সৈনিক হয়ে লড়াই করছি।

মাতৃভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার দাবি নিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা তা একদিন কেমন করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটালো বিশ্ব-ইতিহাসের সেই চমকপ্রদ উজ্জ্বল অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত হবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য, আমি গর্বিত।

www.pathagar.com

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে, রণাঙ্গণে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সেনানীর মিলিত রক্তস্রোতে এক আশ্চর্য মেলবন্ধন রচিত হয়েছিল। মৈত্রী-বন্ধনের সেই অনন্য নজীর বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আমরা? আমরা যারা ভারত-বাংলাদেশের মিলিত ঐতিহাসিক সংগ্রামকে কাছ থেকে দেখেছি তারা সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবার দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারি না। সেই দায়বদ্ধতাবোধ থেকেই আমার এই সামান্য প্রয়াস।

ভারত-বাংলাদেশের অগণিত শহীদের মিলিত রক্তে যে মৈত্রী বন্ধন রচিত হয়েছে তা চিরদিন অটুট রাখতে আমার এই স্মৃতিচারণ দুই দেশের মানুষকে যদি কিছুটাও অনুপ্রাণিত করতে পারে তবেই আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

কলকাতা
জুন ২০০০

উপেন তরফদার

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
১.	প্রথম অধ্যায় - বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ	-	৯-৪৯
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় - স্মৃতি তুমি বেদনা	-	৫০-৭৯
৩.	উপসংহার	-	৮০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

আমি আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করি ১৯৫৪ সালে। আর অবসর গ্রহণ করি ১৯৯৪ সালে কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে। বেতার দূরদর্শনের এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে আবার পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'সংবাদ বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটির প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলাম। বাইরে থেকে রেকর্ড করে আনা নানা অনুষ্ঠান আর ঘটনার খবর আর শব্দচিত্র দিয়ে সাজানো এই অনুষ্ঠানটির সৃষ্টিধর্মী কাজে ছিল বৈচিত্র্য, উত্তেজনা আর আনন্দ। আমাদের দেশে তখনও দূরদর্শন আসেনি আর সেই সময় 'সংবাদ বিচিত্রা'ই ছিল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বাইরে থেকে রেকর্ড করে আনা একমাত্র সংবাদ-ভিত্তিক অনুষ্ঠান। স্বভাবতঃই এর জনপ্রিয়তা ছিল খুবই বেশি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই হোক, কোন দুর্ঘটনা অথবা উৎসব-আনন্দের মুহূর্তই হোক আর খেলার মাঠের উত্তেজনাময় পরিবেশই হোক, সব কিছুকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে শ্রোতাদের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে দেয়ার কাজে ছিল এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি আর অবশ্যই সৃষ্টির উন্মাদনা!

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আকাশবাণী, বিশেষ করে কলকাতা কেন্দ্রের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। আর আমার কর্মজীবনে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম অধ্যায় বলে মনে করি। নির্যাতিত নিপীড়িত বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে একদিন আমরা আবিষ্কার করলাম পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ওপার বাংলার সংগ্রামী ভাই-বোনেদের সঙ্গে আমরাও এক একজন সৈনিক হয়ে লড়াই করছি। অবশ্য আমাদের লড়াইটা ছিল রণক্ষেত্রে নয়–বেতারের মাধ্যমে।

প্রায় এক বছরব্যাপী বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধে আমরা এমনভাবে একাত্ম হয়ে পড়েছিলাম যে আমরা অনেকেই এই সময় সাপ্তাহিক ছুটি নেবার সুযোগ পর্যন্ত পাইনি। না, কর্তৃপক্ষ আমাদের ছুটি নিতে নিষেধ করেননি, করতে পারেনও না। আমাদেরই মনে হতো, একদিন অফিসে না গেলে হয়তো অনেক কিছু হারাবো।

www.pathagar.com

মনে পড়ছে, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তখনকার জনসংযোগ আধিকারিক শ্রদ্ধেয় সমর বসু একদিন পরিহাস করে বলেছিলেন, "কি হে! বাংলাদেশের যুদ্ধ তো তোমরা ত্রিমূর্তিই জিতিয়ে দেবে।" 'ত্রিমূর্তি' বলতে সমরদা বোঝাতে চাইছিলেন–প্রণবেশ সেন, দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি। প্রণবেশ সেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের আর একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'সংবাদ পরিক্রমা'র লেখক। আর দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অসাধারণ কণ্ঠ আর বাচনভঙ্গি দিয়ে, আমাদের নানা অনুষ্ঠান আকর্ষণীয়ভাবে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতেন। অবশ্য সংবাদ বিভাগে আরো অনেক কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী তখন একইভাবে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট বেতার সাংবাদিক নির্মল সেন গুপ্ত, সংবাদ পাঠক তরুণ চক্রবর্তী ও গৌতম বসু এবং আমাদের তখনকার বার্তা সম্পাদক দ্বীপেশ ভৌমিক, যিনি পরবর্তী সময়ে আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আসলে মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিনের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পেরেছিলাম, পেরেছিলাম ওপার বাংলার ভাইবোনদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র বিশেষ করে সংবাদ বিভাগ, তখন একটি পরিবারের মতো ছিল, আমরা একটি দল হিসেবেই কাজ করেছি। সেদিনের সেই স্মরণীয় সংগ্রামের অনেক নাটকীয় ঘটনা, অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, আজও আমাকে আবেগে উত্তেজনায় সময় সময় উদ্বেল করে তোলে।

আজ অবসর জীবনে মাঝে মাঝে ভাবি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এমনভাবে সামিল হবার পেছনে শুধু কি আমাদের পেশাগত দায়বদ্ধতাই কাজ করেছিল? শুধুই কি কর্তব্যনিষ্ঠা আমাদের সেদিন এমনভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাকে অতীতের স্মৃতির পাতা হাতড়াতে হয়, হাতড়াতে হাতড়াতে আমি পৌঁছে যাই আজকের বাংলাদেশের এক অজানা গ্রামে।

কবি জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র কথা মনে হলেই আমার স্মৃতি বারবার ফিরে যায় আমার জন্মভূমি আজকের বাংলাদেশে। আমাদের বাড়ি ছিল মানিকগঞ্জের নালী গ্রামে। গোয়ালন্দ ঘাট থেকে পদ্মা পার হলেই পাটুরিয়াঘাট আর সেখান থেকে আমাদের গ্রাম আধ কিলোমিটার হবে। অবশ্য আমরা স্টিমারে যখন পদ্মা নদী পার হতাম তখন আরিচা ঘাটে নেমে বাড়ি যেতে হতো। তবে প্রতিদিন সকালে তখন পাটুরিয়া ঘাট থেকে পদ্মা পার হয়ে গোয়ালন্দ যাবার জন্য একটি ফেরী নৌকো যাতায়াত করতো। একে বলা হতো 'বাজারের নৌকা।' আশেপাশের গ্রাম থেকে দুধ, সব্জি এবং অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে গোয়ালন্দঘাটে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হতো বলেই বোধ হয় এই নামকরণ ছিল। কৈশোরে দু' একবার আমার এই লম্বা বাজারের নৌকোয় পদ্মা পার হওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অবশ্য আজকের পদ্মার চেহারা দেখে সেদিনের পদ্মার বিশালতার ধারণা করা সম্ভব নয়। পদ্মা ও

www.pathagar.com

মেঘনা এখানে মিশে পাশাপাশি বয়ে চলায় নদী কয়েক কিলোমিটার চওড়া ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! মিশে গেলেও দু'টি নদী যে পাশাপাশি বয়ে চলেছে তা পরিষ্কার বোঝা যেত জলের রং দেখে। এই পদ্মায় সামান্য বাতাস বইতে থাকলে একতলা-দোতলা সমান উঁচু ঢেউ-এর মধ্যে নৌকোতে পার হওয়া একজন কিশোরের পক্ষে সুখকর তো নয়ই, অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। যে কথা বলছিলাম 'রূপসী বাংলা'। হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের একদিকে বিশাল ভয়াবহ পদ্মা, আর একদিকে শান্ত ছোট ইছামতি নদী। মাঝে সবুজে ঢাকা ছবির মতো ছোট আমাদের গ্রাম। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, খেজুর, নারকেল, সুপুরী, নানা রকম গাছ দিয়ে সাজানো এক একটি বাড়ি। আর বিভিন্ন বসত এলাকায় মাঝে মধ্যে বিস্তৃত চাষের জমি। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। আর এই পরিবেশেই ছয় ঋতুর বৈচিত্র্যময় গ্রামবাংলার অপরূপ রূপ দেখে ১২টি বছর কাটিয়েছি আমি। বর্ষায় যে দিন প্রথম নতুন জলের ধারা ধীরে ধীরে আমাদের গ্রামে ঢুকে আশপাশের পুকুর খানা ডোবা ভরিয়ে তুলতো সেদিনের সেকি উত্তেজনা! মনে আছে দল বেঁধে আমরা ঐ জলের ধারার সঙ্গে এগিয়ে যেতাম। যেন ভগীরথ গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। নতুন জলের ধারা আমাদের বাড়ির পুকুরে যেদিন পড়তো সেদিনের কথাও মনে পড়ছে। সারাদিন ধরে জল পড়ে পুকুর ভরিয়ে তুলতো আর ঐ নতুন জলের আগমনীবার্তা মুহূর্তে পৌঁছে যেত পুকুরে বসবাসকারী অসংখ্য মাছের কাছে। কই, মাগুর, ট্যাংরা, পুঁটি হরেক রকমের মাছ তখন হয়তো বদ্ধজলাশয় থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় জড়ো হতো নতুন জলের ধারার কাছে। কিন্তু যেভাবে প্রচণ্ড গতিতে ওপর থেকে জল নিচে পুকুরে এসে পড়তো, তাকে কাটিয়ে ওপরে যাবার সাধ্য ওদের ছিল না।

তাই হয়তো ওরা বেপরোয়া হয়ে ওপরে ওঠার জন্য লাফিয়ে উঠতো আর এই ভাবে আশপাশের শুকনো জমিতে অসংখ্য মাছ এসে পড়তো। আমরা সবাই যে যার জায়গায় সেই মাছগুলো জমা করতাম। সেদিনটা আমাদের মাছ ধরার আনন্দেই কেটে যেত। বর্ষায় সব এলাকাই ডুবে যেত জলে। চারিদিকে শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে উঁচু জমিতে এক একটা বাড়ি। বর্ষায় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে নৌকো ছাড়া উপায় ছিল না। অবশ্য বাঁশ দিয়ে সাঁকো বানিয়ে কোথাও কোথাও যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হতো। আবার শরৎকালে নীল আকাশ, মাঝে মাঝে তুলোর মতো সাদা মেঘের আনাগোনা। নিচে শিউলি বিছানো পথ। শীতের খেজুর রস আর বাড়িতে তৈরি গুড়। নদীতে পুকুরে অজস্র মাছ আর প্রচুর শাক-সব্জি। গ্রীষ্মে আম-জাম-কাঁঠালের ছড়াছড়ি। ছোট বেলায় আম কুড়োনো আর এক মজার ব্যাপার ছিল। গাছে গাছে পাকা আম ভর্তি হয়ে থাকতো। একটু ঝড় উঠলেই টুপটুপ করে আম নিচে পড়তো, আর আমরা আম কুড়াবার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতাম। আপনারা হয়তো ভাবছেন ধান ভানতে আবার শিবের গীত কেন? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আকাশবাণীর 'সংবাদ বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটির ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে আমি

www.pathagar.com

আমার কথা, আমার গ্রামের কথা বলছি কেন? আসলে মুস্কিল হয়ে যায় এখানেই। বাংলাদেশের কথা বলতে গেলেই আমি কেমন যেন একটু বেশি আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি। বারে বারে মন ছুটে যায়, সেই ছোট গ্রামটির দিকে, সেখানকার শৈশবের বন্ধু-বান্ধবের দিকে। স্মৃতি বারে বারে হাতড়ে বেড়ায়। ফেলে আসা সেই সোনার দিনগুলোতে। আমাদের গ্রামের একমাত্র স্কুলটি ছিল 'মাইনর' অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সেখানে পড়ার সুযোগ ছিল। এই স্কুলের পাঠ শেষ করে, আমাদের গ্রাম থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে মেঘলা-মালিকান্দা হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। নারিশায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনার ব্যবস্থা হলো। নারিশা ছিল ভাগ্যকুলের কাছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, এই মেঘলা মালিকান্দা হাইস্কুলের পাশেই ছিল পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডা. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের বাড়ি। মাত্র একটি বছর ঐ স্কুলে পড়ে পাড়ি দিলাম এপার বাংলায়, ১৯৪৮ সালে। দেশ ভাগ হয়ে গেছে তখন। তবু বলি, দেশ ভাগের জন্য আমি এপার বাংলায় আসিনি। আসলে, উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের বাইরে যেতেই হতো। আর যেহেতু পদ্মা পেরিয়ে ট্রেনে উঠলেই কলকাতায় সেই দিনই পৌঁছান যেত তাই উচ্চশিক্ষা আর কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য কলকাতাকে বেছে নেয়ার রেওয়াজ আমাদের গ্রামে চালু ছিল দেশ ভাগের আগে থেকেই। তাই একদিন রেলে কর্মরত ভগ্নিপতির সঙ্গে পদ্মা পার হয়ে এপার বাংলায় চলে এলাম। পেছনে পড়ে রইল আমার বাবা-মা-ঠাকুরমা অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব এবং নদী-নালা আর সবুজে ঘেরা আমার জন্মভূমি। আমার বয়স তখন ১১/১২ বছর। কিন্তু চলে আসার সেই দিনটির কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। স্টীমারে ট্রেনে সারাটা পথই চোখের জল ফেলেছিলাম। আর দিদি বারে বারে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, "সামনের গরমের ছুটিতে আবার পূজোর ছুটিতে, দেশে ফিরে আসবি। তাছাড়া ওখানে দেখবি কত নতুন বন্ধু হবে। কত বড় শহর, সিনেমা, থিয়েটার কত মজা! হ্যাঁ, শহরে অনেক কিছু ছিল। বড় বড় দালান, বিশাল চওড়া পাকা রাস্তা, সিনেমা-থিয়েটার। কিন্তু কোথায় সেই সবুজের ছোঁয়া? কোথায় সেই নদী-নালা? কোথায় সেই খোলামেলা সহজ সরল জীবন? এখানে যেন সবই নিয়মে বাঁধা। মনটা ভীষণ দমে গেল। কিন্তু উপায় তো নেই। অপেক্ষা করতে লাগলাম সেই গরমের ছুটির জন্য। সত্যি সেই গ্রীষ্মের আর পূজোর ছুটিতে আবার দেশে ফিরে যাওয়ার যে কি আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু বেশি দিন সে আনন্দটুকু ভোগ করবার সুযোগও হারিয়ে গেল। ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত শুরু হলো।

আসলে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস নিয়েই দেশ ভাগ হয়েছিল বিদেশী শাসকের চক্রান্তে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশ ভাগের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছিলাম তার মূলে ছিল পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস-ঘৃণা-হিংসা। তাই প্রতিপদে,

www.pathagar.com

দুটি দেশের সাধারণ মানুষকে এর জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে। কিন্তু দেশ ভাগের মূল্য বোধ হয় বেশি দিতে হয়েছে বাংলাকে। কারণ এপার বাংলা, ওপার বাংলার মানুষের ভাষা এক সংস্কৃতি এক- একই রকম পরিবেশে গড়ে উঠেছি আমরা। ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ ভাগের অনিবার্য পরিণতি জাতি দাঙ্গায় দলে দলে মানুষ এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে অনিশ্চয়তার পথে পাড়ি দিলেন। আমাদের গ্রাম থেকেও বহু পরিবার আশঙ্কায় নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে এপারে চলে এলেন। আমার বাবা কিন্তু বিশ্বাস করতেন, এই কৃত্রিম বিভাগ চিরস্থায়ী হতে পারে না। এই বিশ্বাস নিয়েই আমার বাবা, মা আর ঠাকুমাকে নিয়ে দেশেই রয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে আমি স্কুল কলেজের পাঠ চুকিয়ে আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগে যোগদান করলাম। বাবা-মা-আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও মনটা কিন্তু পড়ে রইলো সেই বাংলাদেশে আমার জন্মস্থানে যেখানে আমার শৈশব আর কৈশোরের অনেক স্বপ্নে ভরা সময় কাটিয়েছি। তাই হয়তো পরবর্তীকালে, কর্মজীবনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের অগোচরেই এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত, এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে আমি নিজেকে তাই শুধু একজন বেতার সাংবাদিক হিসেবেই নয় একজন সংগ্রামী সৈনিক হিসেবে ভাবতে গর্ব অনুভব করি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। অনেক ত্যাগ, অনেক রক্ত আর নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছেন। তাঁদের এই ত্যাগ, তাঁদের এই সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়কেই তুলে ধরা হতো 'সংবাদ বিচিত্রা'য়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'সংবাদ বিচিত্রা'র ভূমিকার কথা বলতে গেলে সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় ধরেই আমাদের এগোতে হবে। এখানে বলে রাখি ওপার বাংলার মানুষের উপর যে কোন লাঞ্ছনা, অত্যাচার, আঘাত এপার বাংলার মানুষকেও ব্যথিত করে তুলতো। কারণ, ভুললে চলবে না দুই বাংলার ভাষা এক, সংস্কৃতি এক। একই পরিবেশে আমরা মানুষ। আমরা একদিন একই বাংলায় বসবাস করতাম। স্বভাবতঃই ওপার বাংলার যেকোন ঘটনা, যেকোন সংবাদের জন্যেই এপারের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। শ্রোতাদের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়কে 'সংবাদ বিচিত্রা'য় তুলে ধরতে আমরা শুরু থেকেই সচেষ্ট ছিলাম। শুধু ধর্মের ওপর ভিত্তি করে একটি দেশকে ভাগ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কল্পনাই ছিল অবাস্তব। শুধু ভৌগোলিক দিক থেকেই নয়, ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সবদিক থেকেই পাকিস্তানের এই দুটি খন্ডের মধ্যে কোন মিল ছিল না। অথচ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই মুসলিম লীগ কোন নির্বাচন না করেই দেশ শাসন করছিল।

www.pathagar.com

শাসন না বলে, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ বলাই বোধ হয় ভাল। শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য এবং অন্যান্য অবিচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের মনে ক্ষোভ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো বাংলাদেশ, বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়। ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা হরতাল ডাকলো। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ১৪৪ ধারা জারি করলেন। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে সেদিন মিছিল বের করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলী চালায়। রফিক, জব্বার, সালাম আর বরকত গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ঢাকার রাজপথ মাতৃভাষার পূজারী চারজন তরুণের তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠলো। খবরটি দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে মানুষ রাস্তায় নেমে এলেন। মাতৃভাষার জন্য ওপারের ছাত্রদের এই আত্মাহুতি এপারের মানুষকেও সমানভাবে আলোড়িত করলো। এখানেও শুরু হলো মৌন মিছিল আর ভাষা শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য স্মরণসভা। বেদনাহত বাংলাদেশের মানুষের চোখের জল দিয়ে রচিত হোল সেই ২১শে ফেব্রুয়ারির অবিস্মরণীয় গান-

আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

কেমন করে জানি না–ওপারের সেই গান এসে পৌঁছল এপারেও। মিছিলে-সভায়-আকাশে বাতাসে অনুরণিত হোল সেই গানের সুর। সংবাদ বিচিত্রতার মাধ্যমে সেই গান আর এপার বাংলার মানুষের ক্ষোভ বেদনা প্রচার করা হলো বেতারে। মনে পড়ছে, শ্রোতাদের কাছ থেকে অনুরোধ এলো পুরো গানটি বারে বারে প্রচারের জন্য। বুঝলাম এপার-ওপার দু'বাংলার মানুষের মনই আজ এক সুরে বাঁধা। মাতৃভাষার প্রতি আঘাতই তাদের আজ ঐক্যবদ্ধ করেছে। বলতে দ্বিধা নেই ভাষা আন্দোলনের সেই আত্মিক মেলবন্ধনের সন্ধান পেয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী ঘটনাবলীকে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরার বাড়তি উৎসাহ পেয়েছি।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশের মুক্তি হঠাৎ আসেনি। এর জন্য সেখানকার মানুষকে অনেক সংগ্রাম আর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। মনে পড়ছে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলানা ভাসানী, ফজলুল হক আর সুরাবর্দী সাহেব এবং অন্যান্য দল মিলিতভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ২১ দফা দাবিপত্র ঘোষণা করলেন এবং নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নির্বাচনের ফলাফলকে তোয়াক্কা না করে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ক্ষমতা দখল করে নিজের খেয়ালখুশি মতো দেশ শাসন করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে

www.pathagar.com

সুযোগ বুঝে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান মীর্জাকে সরিয়ে সামরিক শাসন কায়েম করলেন। সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়ে বন্দুকের নল উঁচিয়ে দেশ শাসন করা হতে লাগলো। ১৯৬২ সালে আয়ুব খানের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে বাংলাদেশের ছাত্ররা পুনরায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন পুলিশের গুলীতে প্রাণ দেন। পূর্ব-পাকিস্তানের এই সব আন্দোলন থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে আনবার জন্য ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সামরিক সরকার আচমকা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলো। কিন্তু এই যুদ্ধেও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অবহেলা আর বৈষম্যমূলক আচরণ আরো প্রকট হয়ে উঠলো। এদিকে, ভারতের তদনান্তীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই বি চ্যাবন ঘোষণা করলেন "পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই।" অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি ও অধিকার নিয়ে শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা দাবিপত্র ঘোষণা করলেন। পাকিস্তানী সামরিক শাসক, শেখ মুজিব এবং আরো ৩৪ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মিথ্যা ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করে তাদের কারাগারে ঢোকালো। এবার মুজিবের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ছাত্রদের ১১ দফা দাবি আর সাধারণ মানুষের ৬-দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন একদিকে যত তীব্রতর হতে লাগলো অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীও রাইফেল হাতে ততবেশী নির্দয় হয়ে উঠলো। অবশেষে জনগণের তীব্র আন্দোলনে বাধ্য হয়েই শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হলো। ১৯৬৯ সালে রেসকোর্সের বিশাল জনসভায়, শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হলো। আইয়ুব খান এই সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে সব দায়িত্ব দিয়ে সরে দাঁড়ালেন।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানে আর একবার নির্বাচন হলো। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে ইয়াহিয়া খান চমকে গেলেন। যতদূর মনে পড়ছে, পূর্ব-পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু মুজিবের আওয়ামী লীগ ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন দখল করেছিলেন। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল, পাকিস্তান পিপলস পার্টি পেয়েছিল মাত্র ৮৩টি আসন। ফলে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো। এখানেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদল প্রমাদ গুণলো। তারা কিছুতেই পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিতে পারছিল না। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানের হাতেই দেশ শাসনের ক্ষমতা চলে যাবে। অথচ উপায় তো নেই। নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নিতে হলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের আধিপত্য মেনে নিতেই হবে।

যাই হোক, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় গিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করলেন "মুজিবই পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী।" তিনি আরো ঘোষণা করলেন–"১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের

www.pathagar.com

অধিবেশন শুরু হবে।" সারা পূর্ব-পাকিস্তান সেদিন উল্লাসে ফেটে পড়লো। কিন্তু আসলে এই ঘোষণা ছিল ইয়াহিয়া খানের আর একটি ধাপ্পা। করাচীতে ফিরে গিয়েই ইয়াহিয়া খান স্বমূর্তি ধরে ঘোষণা করলেন "৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের নির্ধারিত অধিবেশন হবে না।"

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষোভে গর্জে উঠলেন, আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠলো সারাদেশ। এরপর একের পর এক ঘটনায় আলোড়িত হতে লাগলো পূর্ব-পাকিস্তান। দ্রুত পটপরিবর্তন হতে লাগলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের। আমরাও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যথাসম্ভব পূর্ব-পাকিস্তানের ঘটনাবলী এবং এপার বাংলায় তার প্রতিক্রিয়া শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরছি। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানবার জন্য এপারের মানুষ অধীর আগ্রহে রেডিও খুলে বসে থাকতেন।

১৯৭১ সালের ৩রা মার্চেই ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের নাম, সীমা, জাতীয় পতাকা এবং অন্যান্য জরুরী বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। আসলে এই সভাই হলো নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মলগ্ন।

অবশেষে এল সেই স্মরণীয় দিন ৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধু ঐদিন রমনা ময়দানের জনসভায় সবাইকে যোগদানের জন্য আহবান জানালেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন জমায়েত হলেন রমনা ময়দানে। বিশাল ঐ জনসভায় বজ্রকণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর সেই উদাত্ত ঘোষণা "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এখন আর ৬ দফা নয়, ১১ দফা নয় এক দফা দাবি নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাংলাদেশের মানুষ। তাঁদের এখন একটাই দাবি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা। শুরু হলো পাকিস্তানের সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের অঘোষিত যুদ্ধ।

বাংলাদেশের এইসব নানা নাটকীয় ঘটনায় বারে বারে আলোড়িত হয়েছে এপার বাংলাও। অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখর হয়েছে কলকাতা মহানগরী। কখনও মিছিলে, কখনও প্রতিবাদী সভায় উপস্থিত থেকে, আবার কখনও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে, বেতারে তুলে ধরতে হয়েছে আমাকে 'সংবাদ বিচিত্রা'র মাধ্যমে। সেদিনের সেই স্মরণীয় সংগ্রামের অনেক ঘটনা, অনেক মুহূর্ত, আজও আমায় আবেগে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত করে তোলে।

মনে পড়ে, সেই অবিস্মরণীয় গানটির কথা।

শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি ॥

www.pathagar.com

গানটি যিনি গেয়েছিলেন, আমাদের শিল্পী বন্ধু অংশুমান রায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঐ গানটি চিরদিনই ইতিহাস হয়ে থাকবে। এই গানটির ইতিহাস হবার পেছনে আর একটি ইতিহাস আছে।

আমাদের সহকর্মী বন্ধু সংবাদ পাঠক দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সেদিন বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী কামরুল হাসান সাহেব এসেছেন। বাংলাদেশ থেকে তখন যে কোন শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ অথবা অপর যে কোন ব্যক্তিত্ব আমাদের এখানে এলেই ছুটতাম টেপ রেকর্ডার নিয়ে তাঁর কাছে। উদ্দেশ্য, যাতে বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থাটা পৌঁছে দেয়া যায় শ্রোতাদের কাছে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে তখন যোগাযোগ বলতে কিছুই ছিল না। আর পাক বেতারে তো চলছে মিথ্যার বেসাতি আর অপপ্রচার।

দেব দুলালের কাছ থেকে টেলিফোনে কামরুল হাসান সাহেবের আসার খবরটি পেয়েই টেপ রেকর্ডার নিয়ে ছুটলাম ওর পূর্ণ দাস রোডের বাড়িতে। পৌঁছে দেখি হাসান সাহেব ছাড়াও সেখানে উপস্থিত আছেন গৌরীদা অর্থাৎ গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, লোকসঙ্গীত শিল্পী দীনেন্দ্র চৌধুরী আর অংশুমান রায়। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর হাসান সাহেবের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করলাম। কাজ শেষ, তাই টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে ফিরে আসব বলে উঠেছি। তখন অংশুমান হাসান সাহেবকে একটি গান শোনাতে চাইলো। গানটি বাংলাদেশ নিয়ে, গৌরীদার লেখা। আবার বসে, টেপ রেকর্ডার খুললাম। কারণ বাংলাদেশ নিয়ে আমি যা পাই তাই তখন সংগ্রহ করি। আর এখানে তো সাক্ষাৎকারের সঙ্গে গান কিছুটা দিলে অনুষ্ঠানে কিছুটা বৈচিত্র্য আসবে! গান তো হবে, কিন্তু হারমোনিয়াম-তবলা কোথায়? তবলা বাজাবেই বা কে? আসলে, সেদিন কেউ আমরা গানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি। দেব দুলালের বাড়িতে নিচের তলাতেই থাকতেন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই, একটি হারমোনিয়াম আনা হলো। কিন্তু তবলা? কুছ পরোয়া নেই! দীপেন পাশ থেকে একটি বাঁধানো খাতা নিয়ে তার ওপর আঙ্গুল ঠুকে দিব্যি তবলার কাজ চালিয়ে দিল। আমরা সবাই নির্বাক! আমার বেশ মনে আছে গানটি সেদিন আমাদের এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে আমরা সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম, কারো মুখে কোন কথা ছিল না। গানের কথায় আর সুরে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম অথবা আবেগতাড়িত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম! কি জানি, হয়তো বা দুটোই। যাই হোক, হাসান সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে স্টুডিওতে ফিরে এলাম।

৭ই মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা পাকিস্তানী বেতার গতকাল প্রচার করেনি। কিন্তু স্টুডিওতে ফিরে এসে শুনলাম,

www.pathagar.com

আজ সেই ভাষণটি কেন জানি না, ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত করা হয়েছে আর আমাদের এখানে তা রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে ভাষণটির কিছু অংশ আজকের সংবাদ বিচিত্রায় নেয়া হবে। আমি কিন্তু ভাষণটি তখনও শুনিনি। মনটা দমে গেল। কারণ এতক্ষণ ছক কষছিলাম কামরুল হাসানের সাক্ষাৎকার আর অংশুমানের গান কিভাবে সাজানো যায়। যাই হোক, বঙ্গবন্ধুর রেকর্ড করা ভাষণের টেপ নিয়ে স্টুডিওতে ঢুকলাম। কিন্তু ভাষণটি শুনে আমি তো প্রচণ্ড ভাবে উত্তেজিত, শিহরিত! চোখ তুলে দেখি, বহু সহকর্মীর ভিড়। শুধু আমি নই, সবাই ভাষণটি শুনে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত। বঙ্গবন্ধু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে জ্বালাময়ী সহজ-সরল ভাষায় পূর্ব-পাকিস্তারের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ, নানা অবিচার, অত্যাচার আর লাঞ্ছনার বেদনাময় কাহিনী অত্যন্ত জোরালো ভাবে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। ভাষণের শেষ পর্বে উদাত্তকণ্ঠে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে আহবান জানিয়েছেন। মনে পড়ছে, বজ্রকণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর সেই তেজোদ্দীপ্ত ঘোষণা, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ!" কি যাদু ছিল সেই ভাষণে জানি না- সেই মুহূর্তে যদি সুযোগ থাকতো, তবে আমিও ওপার বাংলার ভাই বোনদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম, অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম তাদের মুক্তিযুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি, বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণে সাড়া দিয়ে–যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ।

একটু ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, সেদিনের 'সংবাদ বিচিত্রা'র জন্য ভাষ্য লেখার প্রয়োজন নেই। অংশুমানের গানের কিছু অংশ, তারপর বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছু অংশ, আবার অংশুমানের গান, আবার মুজিবের ভাষণ–এভাবেই গান আর ভাষণ দিয়ে সাজানো হলো সেদিনের 'সংবাদ বিচিত্রা'। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি শুধু দুই বাংলার অগণিত শ্রোতা নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এমনকি বিদেশে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যেও বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অসংখ্য শ্রোতার দাবি মেনে, অনুষ্ঠানটি একাধিকবার প্রচারও করা হয়েছিল।

পরে অংশুমানের এই গানটি ক্যাসেটে রেকর্ড করে বাজারে ছাড়া হয়েছিল এবং সেখানেও গানটি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিয়েই শুরু করা হয়েছিল। এই গানটির ইংরেজী অনুবাদও একই সুরে অংশু রেকর্ড করেছিল। অনেকেই জানেন সেই ক্যাসেট তখন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। আর শিল্পী অংশুমানের তো তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত! একদিন আকাশবাণীতে এসে আমাকে তো প্রায় ধমক দিয়েই বললো "তুমি আমায় কি সর্বনাশ করেছো বল তো! সকাল নেই বিকেল নেই অনুষ্ঠানে যেতে হবে আর শ্রোতাদের সেই এক দাবি, সেই গান শোনাতে হবে, *শোন, একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের* আরে আমি কি অন্য কোন গান জানি না।" হেসে বলি, "তারকা শিল্পী হতে গেলে এই সব ঝামেলা সইতেই হবে।"

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। অনুষ্ঠানটি বেতারে প্রচারের পরের দিন আকাশবাণীতে গেছি। সব জায়গাতেই একই আলোচনা। অংশুমানের গান আর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। অনুষ্ঠানটির জন্য সবার অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে স্টুডিওতে ঢুকতেই দেখি, সামনে আমাদের তখনকার কেন্দ্র অধিকর্তা দিলীপ কুমার সেনগুপ্ত। তিনি বেশ ধমকেই বললেন, "কাল সংবাদ-বিচিত্রায় কি করেছ? তোমায় আমি মেমো দেবো।" আমি তো অবাক! কি এমন ভুল করলাম যাতে উনি এতটা উত্তেজিত হলেন! কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যই আমায় উদ্বিগ্ন থাকতে হয়েছিল। কেন্দ্র-অধিকর্তা হঠাৎ আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন শুধু খারাপ কাজের জন্য নয় ভাল কাজের জন্যও মেমো দেয়া হয়। কাল তোমার 'সংবাদ বিচিত্রা' শুনে আমি কেঁদেছি।" সত্যিই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেদিনের 'সংবাদ বিচিত্রা'র প্রশংসা করে উনি আমায় একটি মেমো পাঠিয়েছিলেন। ঘটনাটি উল্লেখ করলাম আত্মপ্রচারের জন্য নয়। সেই সময় নীচু থেকে উঁচু, আকাশবাণীর প্রতিটি সহকর্মী কেমনভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, আমাদের কেন্দ্র-অধিকর্তার কান্না তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রসঙ্গত জানাই, আকাশবাণী কলকাতার কেন্দ্র-অধিকর্তা দিলীপ কুমার সেনগুপ্তের বাংলাদেশ নিয়ে 'রেডিও কার্টুন' নামে অভিনব অনুষ্ঠানটি তখন যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

পরে, আমার কাছে বহু শিল্পী বন্ধু অনুযোগ করেছিলেন, অংশুমান রায়কে 'সংবাদ বিচিত্রা'র মাধ্যমে এমন ভাবে তুলে ধরা হলো, অথচ তাদের কোন সুযোগ কেন দেয়া হয় না। গৌরীদাও সেই সময় বাংলাদেশ নিয়ে আর একটি গান লিখে একজন বিশিষ্ট শিল্পীকে আমার কাছে এনেছিলেন। আমিও সেই গান রেকর্ড করে কিছুটা অংশ ব্যবহার করেছিলাম 'সংবাদ বিচিত্রা'য়। কিন্তু সে গান তেমনভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি। মুস্কিল হলো কোন শিল্পীর গান এভাবে 'সংবাদ বিচিত্রা'য় প্রচার করা হয় না। অনুষ্ঠান থেকে রেকর্ড করে আনা গানের কিছু অংশ মাঝে মাঝে অবশ্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তা শুধু অনুষ্ঠানে কিছুটা বৈচিত্র্য আনার জন্য এবং বিষয়টি আরো আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরতে, উপযুক্ত পরিবেশ রচনার জন্য। সেদিন অংশুমানের গান সবটাই ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল ব্যতিক্রমী ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত ভাষণটি শ্রোতাদের যাতে আরো ভালোভাবে নাড়া দেয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এটা করা হয়েছিল।

আসলে গানের এ হৃদয়স্পর্শী ভাষা, মন মাতানো সুর, দরদী কণ্ঠ আর বঙ্গবন্ধুর সেই রক্ত গরম-করা ভাষণ এবং সর্বোপরি দুই বাংলার মানুষের আবেগ আর উত্তেজনায় ভরা সে সময়ের পরিবেশ, সব মিলিয়েই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের মনকে এমনভাবে নাড়া দিতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

সেদিনের সাড়া-জাগানো সেই সংবাদ বিচিত্রতার একটি রূপরেখা এখানে তুলে দেয়া হলো, যাতে এই প্রজন্মের পাঠকরা যারা অনুষ্ঠানটি শোনেননি, তারা কিছুটা হলেও সেদিনের আবেগ আর উত্তেজনার উত্তাপ অনুভব করতে পারেন।

আকাশবাণী, কলকাতা

সংবাদ বিচিত্রা

[অনুষ্ঠান–পরিচায়ক সুর Signature Tune]

আজকের অনুষ্ঠানে

বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ

[অনুষ্ঠান-পরিচায়ক সুর]

(সুরের রেশ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অংশুমানের গানের একটি অংশ)
শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ॥

[বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশ]

২৪ বছরের করুণ ইতিহাস–বাংলার অত্যাচারের–বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৪ বছরের ইতিহাস বাংলার নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। ১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও–আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান 'মার্শাল ল' জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে দুর্বার আন্দোলনে–আমার ছেলেদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন খান সাহেব অবসর নিলেন–তিনি বললেন দেশের শাসনতন্ত্র দেবেন গণতন্ত্র দেবেন–আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল। নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলা নয় পাকিস্তানের মেজরিটির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে। আমরা এ্যাসেমব্লীতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লীর মধ্যে আমরা আলোচনা করবো। এমনকি, আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়–তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বললেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ হবে না, আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করলাম। আপনারা আসুন আলোচনায় বসুন। আমরা আলাপ করে

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসেন তবে কসাই খানা হবে এ্যাসেমব্লী। তিনি বললেন যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে। যদি কেউ এ্যাসেমব্লীতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম এ্যাসেমব্লী চলবে। তারপর এক তারিখে হঠাৎ এ্যাসেমব্লী বন্ধ করে দেয়া হলো। আমি বললাম শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম আপনারা কল কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি–বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের ওপর! তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙ্গালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান কারা গরীবের উপর–আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।

[অংশুমান রায়ের গান]

সেই সবুজের বুক চেরা মেঠোপথে,
আবার এসে ফিরে যাবো
আমার হারানো বাংলাকে
আবার তো ফিরে পাবো
শিল্পে কাব্যে কোথায় আছে হায়রে
এমন সোনার দেশ ॥
শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ॥

[বঙ্গবন্ধুর ভাষণ]

"ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এ্যাসেমব্লী কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এ্যাসেমব্লী কল করেছেন আমার–দাবি মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মার্শাল'ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকেদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে আমার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে-

www.pathagar.com

তার তদন্ত করতে হবে। আর-জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো-আমরা এ্যাসেমব্লীতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এ্যাসেমব্লীতে বসতে আমরা পারি না। আমি-আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা মানুষের অধিকার চাই।

[অংশুমানের গান]

বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নেই কো শেষ, বাংলাদেশ।
'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার
এখনও কেন ভাবো
আমার হারানো বাংলাকে
আবার তো ফিরে পাবো,
অন্ধকারে পূবাকাশে উঠবে আবার দিনমণি।
শোন, একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ ॥

[বঙ্গবন্ধুর ভাষণ]

"প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এবং রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার না পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো-আমরা পানিতে মারবো। তোমারা আমার ভাই, ব্যারাকে থাকো। কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর। আমাদের যেন বদনাম না হয়। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও আর চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয় বাঙালীরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল, আর তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

"এবারের সংগ্রাম–আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম–আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
[অনুষ্ঠান পরিচায়ক সুর]
[ঘোষণা]
সংবাদ বিচিত্রা এখানেই শেষ হলো।
রচনা ও প্রযোজনা–উপেন তরফদার।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো দিন। ঐ দিন মধ্য রাতে বর্বর পাক-বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র বাংলার মানুষের ওপর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আগেই বলেছি, পূর্ব পাকিস্তানের তীব্র আন্দোলনে জেরবার হয়ে ইয়াহিয়া খান দেশে নির্বাচনের ডাক দিলেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মুজিবরের নেতৃত্বে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো। স্বভাবতঃই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার হলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভের দামামা বেজে উঠলো। এরপর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে আলোচনায় বসলেন। এই সবই ছিল সামরিক শাসকদের ছল-চাতুরী। পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য শুধু সময় নেয়া। এক সময় ভুট্টো-ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন আলোচনা করতে। কিন্তু আলোচনার বদলে ক্র্যাক ডাউন এর হুকুম দিয়ে ইয়াহিয়া খান কাপুরুষের মতো গোপনে রাওয়ালপিণ্ডি পালিয়ে গেলেন ২৪শে মার্চ।

২৫শে মার্চ, ইয়াহিয়ার সেনা ট্যাঙ্ক, কামান আর মেশিনগান নিয়ে চুরমার করে দিল ঢাকা শহর। জারি হলো 'মার্শাল ল'। মুজিবুর হলেন গৃহবন্দী। আর পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসকের বড়কর্তা হলেন টিক্কা খান। এরপর পূর্ব পাকিস্তানে রচিত হলো হানাদার চেঙ্গিস খানকেও লজ্জা দেয়ার এক বর্বরতার ইতিহাস। সেখানে নিরীহ শান্তিপ্রিয় বাঙালীর ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ধর্ষণ আর নির্বিচারে হত্যার তাণ্ডব শুরু করলো পাক-বাহিনী। ২৬শে মার্চ ইউ.এন.আই-এর টেলিপ্রিন্টারে আসা একটি– FIASH NEWS-এ আলোড়িত হলো সারা বিশ্ব।

"MUJIBUR RAHMAN DECLARES BANGLADESH INDEPENDENT"

দিকে দিকে প্রচারিত হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তা। শুরু হলো প্রতিরোধ।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের পূর্ব নির্দেশ মতো যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাধারণ মানুষ। ঘরে ঘরে গড়ে উঠলো প্রতিরোধের দুর্গ।

প্রতিরোধ যত জোরালো হয় হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডবও ততো নারকীয় হয়। কামান, রাইফেল রকেট, মর্টার নিয়ে রাতের অন্ধকারে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায় মানুষের ওপর। অতর্কিত এই আক্রমণে প্রাণ হারালেন হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ, লুণ্ঠিত হলো অগণিত মা বোনের ইজ্জত।

মনে পড়ছে, ২৫শে মার্চ-এর এই তাণ্ডবলীলার কয়েকদিন পরেই বাংলাদেশের এক তরুণ আকাশবাণীতে এসে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন একটি ক্যাসেট যাতে রেকর্ড করা ছিল ঢাকায় সেই অভিশপ্ত রাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলোর ওপর হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের শব্দচিত্র। সেই গোলাগুলির শব্দচিত্র আর সীমান্ত পেরিয়ে আসা বুলেটবিদ্ধ মানুষের করুণ আর্তনাদ তুলে ধরেছিলাম 'সংবাদ বিচিত্রা'য়। মনে পড়ে, সেই অনুষ্ঠান চলাকালে টেলিফোনে অনেক শ্রোতা সহ্য করতে না পেরে প্রচার বন্ধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

শয়তান পাক বাহিনীর নারকীয় অত্যাচারে বিপন্ন মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে সব কিছু হারিয়ে দলে দলে চলে এলো ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। সে সময়ে আমার প্রধান কাজ ছিল সকালে টেপ রেকর্ডার নিয়ে সীমান্ত এলাকায় যাওয়া, সারাদিন বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের কাছ থেকে পাক বাহিনীর অত্যাচার আর স্বজন-হারানো অসহায় মানুষগুলোর কান্না রেকর্ড করে নিয়ে আসা, আর রাতে এই লাঞ্ছনা আর অত্যাচারের করুণ কাহিনী বেতারে তুলে ধরা। এই সময়ে সীমান্তে হানাদার বাহিনীর তাণ্ডবের শিকার বিপন্ন মানুষগুলোর কথা ভাবলে আমার মন আজও বিষণ্ন হয়ে পড়ে। কত পুত্রহারা মায়ের করুণ আর্তনাদ, কত স্বামীহারা স্ত্রীর আকুল কান্না, বুলেটবিদ্ধ তরতাজা কত তরুণের শেষ কথা 'জয় বাংলা' আমায় রেকর্ড করতে হয়েছে।

সীমান্তে বনগাঁ হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ এক তরুণের এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো বিদায়ের করুণ মুহূর্তটি আজও আমায় ব্যথিত করে তোলে। সীমান্তের ওপার থেকে বুলেটবিদ্ধ ওই তরুণকে সবে তখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। গায়ের জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ডাক্তার জরুরী অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আর সেই তরুণ উত্তেজিত ভাবে সমানে চিৎকার করে চলেছে, "আমাকে আপনারা বাঁচান, আমাকে বাঁচান। আমার মা-বাবা ভাই-বোন সবাইকে ওরা শেষ করেছে। আমি ওদের ছাড়ব না। আমি বদলা ...।" না, কথা শেষ করতে পারেনি সে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো তরুণটি। আমরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলাম।

১৮ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আরো একটি স্মরণীয় দিন। ১৭ এপ্রিল রাতে কাজের শেষে বাড়ী ফিরব ভাবছি তখন জানতে পারলাম

www.pathagar.com

আজ রাতে বাড়ি ফেরা হবে না। কারণ সেই রাতেই আমাদের কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কভারেজে যেতে হবে। এখানে বলে রাখি, আমাদের সে সময়ে এভাবেই যখন-তখন এধার-ওধার ছুটতে হতো। যাই হোক, আমরা শুধু জানতে পারলাম রাত তিনটায় আমাদের কলকাতা ময়দানে প্রেসক্লাবে যেতে হবে। সেখানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জনসংযোগ আধিকারিক সমর বসুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হবে এবং তিনি আমাদের কোথাও নিয়ে যাবেন। এর বেশি আর কিছু জানানো সম্ভব নয়-বলেন আমাদের বার্তা সম্পাদক দ্বীপেশ ভৌমিক।

বন্ধু-সহকর্মী প্রণবেশ সেনকে আর আমাদের ড্রাইভার ভবতোষ দাশকে নিয়ে শেষ রাতে প্রেসক্লাবে উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখলাম বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যেই দেশী-বিদেশী বহু সাংবাদিক হাজির। সমরদাকে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় আমরা যাচ্ছি? সমরদা শুধু মৃদু ধমক দিয়ে বললেন "চলই না"। ব্যস! শুধু এইটুকু বলেই গম্ভীর হয়ে সরে গেলেন। সবার মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনা। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। তবে সেটা কি কেউ পরিষ্কার করে বলছে না। তবে গাড়িতে ওঠার আগে আমাদের জানিয়ে দেয়া হোল বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আমরা সেখানে যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি, কেনই বা যাচ্ছি, কিছুই জানতে পারলাম না। স্বভাবতঃই উত্তেজনা আরো বাড়তে থাকলো!

শেষ রাতের আলো-আঁধারে প্রচন্ড গতিতে আমাদের গাড়িগুলো ছুটছে। বুঝতে পারছি একটা কিছু বড় খবর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কি সে খবর তাই জানি না। ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এলো। ফিকে আলোয় গাড়ি থেকে মুখ বার করে দেখলাম আমরা কৃষ্ণনগর পৌঁছে গেছি। আরো কিছুটা পথ চলার পর আমাদের গাড়ি থামলো। সবাই গাড়ি থেকে নেমে এলাম। বলা হলো, এবার আমাদের কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে। হাঁটা শুরু হলো।

বেশ কিছুটা পথ চলার পর দেখতে পেলাম বেশ কিছু মানুষের আনাগোনা। ততক্ষণে ভোরের আলোতে চারিদিক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। অবশেষে আমাদের 'অভিযান' শেষ হলো। চারিদিকে আম গাছ ঘেরা একটা মাঠের মধ্যে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছেন। মাঠের এধারে ওধারে কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য করলাম ওদের কারো হাতে রাইফেল কারো হাতে এলএমজি। মাঠের এক কোণে ছোট্ট একটি মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। এধারে ওধারে লাল-নীল-সবুজ কাগজ কেটে সাজানো হয়েছে। একটা উৎসবের আমেজ থাকলেও চাপা উত্তেজনাও রয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি জায়গাটি বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর। ওরা নতুন নামকরণ করেছে 'মুজিবনগর'। আরো জানতে পারলাম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রথম নতুন মন্ত্রিসভা আজ এখানে শপথ গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

মনে পড়ছে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা–আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। মঞ্চ থেকে এবার একে একে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন। মুজিবুর রহমান তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অজানা স্থানে কারাগারে বন্দী। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রিসভার আর যে সব সদস্য সেদিন শপথ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন-

(ক) মনসুর আলী
(খ) খোন্দকার মোস্তাক আহ্‌মদ
(গ) কামরুজ্জামান

আর, মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো। প্রতিটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে সমবেত হাজার হাজার মানুষ উল্লসিত হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন তা দেখে আমার সেদিনই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল বাংলাদেশকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। এরপর নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সেদিনের কিছু কথা এখানে তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন–

"আজকে হোক, আগামীকাল হোক, পরশু হোক আমরা জয়লাভ করবই। আমরা পরাজিত হওয়ার জন্য সংগ্রাম শুরু করি নাই। আর এই জয়লাভের ভিতর দিয়ে একটা নতুন জাতির জন্ম হবে।"

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু মুজিবরের পক্ষ থেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদানের জন্য সবার কাছে আবেদন জানালেন। মুজিবনগরের সেদিনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। কিন্তু আন্তরিকতা আর উষ্ণ আবেগে ভরা। সাধারণ মানুষের সেদিনের উল্লাস আর উন্মাদনা আজও আমাকে শিহরিত করে!

বাংলাদেশের জাতীয় নেতাদের ভাষণসহ সবকিছু রেকর্ড করে কলকাতায় ফিরলাম। ফেরার পথে ভাবছিলাম একদিন পলাশীর আম্রকুঞ্জে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। আজ সেই আম্রকুঞ্জ থেকে কিছু দক্ষিণে সীমান্তের ওপারে আর এক আম্রকাননে জন্ম নিল নতুন এক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

স্টুডিওতে ফিরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের যাবতীয় তথ্য বেতারে পৌঁছে দিলাম শ্রোতাদের কাছে। মনে আছে, এই 'সংবাদ বিচিত্রা'য় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শেষে আবার জুড়ে দিয়েছিলাম সেই অংশুমানের গান আর বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দিয়ে তৈরি সেই বিশেষ সংবাদ বিচিত্রাটি।

www.pathagar.com

মুজিবনগরে বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণের পরের দিন, কলকাতার তখনকার পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব হোসেন আলী সদ্যঘোষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। খবর পেয়েই টেপ রেকর্ডার নিয়ে ছুটলাম বাংলাদেশ মিশনে। মনে আছে আমি পদ্মাপাড়ের ছেলে শুনেই তিনি সেদিন আমায় প্রথম পরিচয়েই বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আসলে সেই সময়টাই ছিল আবেগ আর উত্তেজনার।

মি. আলীর সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে করতেই শুনছিলাম পাশের ঘরে বেগম আলীর আবেগ আর উত্তেজনায় ভরা কণ্ঠস্বর। মি. আলীর সাক্ষাৎকার শেষ হতেই অনুরোধ জানালাম বেগম আলীর একটি সাক্ষাৎকারের জন্য। অন্য সময় হলে মি. আলী রাজী হতেন কিনা জানি না, সেদিন কিন্তু কোন দ্বিধা না করেই বেগম আলীকে ডেকে নিলেন তাঁর ঘরে। আর বেগম আলীও সানন্দে রাজি হলেন আকাশবাণীকে কিছু বলতে। টেপ রেকর্ডার চালিয়ে সেদিনকার বাংলাদেশ মিশনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলাম। পাক বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি সেদিন বারে বারে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। আমার মনে আছে সাক্ষাৎকারটি শেষ করেছিলেন এই কটি কথা দিয়ে, "আমরা এখনো গুলির আওয়াজ শুনছি, সেই রক্তস্রোত বয়ে আসছে ইন্ডিয়াতে, সাড়ে সাত কোটির প্রাণের রক্ত। সেই রক্ত দেখে আজ আর আমি সহ্য করতে পারলাম না। না পারার জন্য আজ আমি দেশ স্বাধীন ডিক্লেয়ার্ড করে দিলাম 'জয়বাংলা' বলে।

কথা কয়টি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। কারণ স্টুডিওতে এসে অনেকবার আমায় কথা কয়টি বাজিয়ে শুনতে হয়েছিল। আমি দ্বিধায় ছিলাম, কথা কয়টি বেতারে প্রচার করা ঠিক হবে কিনা? আসলে বেগম আলী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন না। কিন্তু মুস্কিল হলো যেভাবে তিনি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের করুণ কাহিনীর বিবরণ দিতে গিয়ে কথা কয়টি শেষ করেছিলেন সেখানে এডিট করে কথা কয়টি বাদ দেয়া সম্ভব ছিল না। বাদ দিতে হলে সবটাই বাদ দিতে হয়।

অনেক ভেবে আমার মনে হয়েছিল, বেগম আলী 'আমি' বলতে সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের নিপীড়িত লাঞ্ছিত অগণিত মানুষের প্রতিনিধি হয়েই নিজেকে তুলে ধরেছেন। কাজেই শ্রোতাদের তাঁর আসল বক্তব্যটি বুঝতে অসুবিধা হবে না। তাই কোন রকম কাটছাট না করেই মি. আলীর সাক্ষাৎকারের সঙ্গে মিসেস আলীর সাক্ষাৎকারটিও বেতারে নানা তরঙ্গে প্রচার করা হয়েছিল বারে বারে। শ্রোতাদের অসুবিধা হয়ওনি। কারণ বহু শ্রোতা বেগম আলীর সাক্ষাৎকারটির প্রশংসা করেছিলেন, বিভিন্ন কাগজেও এই সাক্ষাৎকারের প্রশস্তি লেখা হয়েছিল।

এখানে মি. আলী ও মিসেস আলীর সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না। মি. আলী সেদিন বলেছিলেন "আপনারা সবাই জানেন

www.pathagar.com

বাংলাদেশে নৃশংস অত্যাচার করে হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে কেটে ফেলা হয়েছে। এটা Selected genocide chosen people–marked people তাঁদের ধরে ধরে–Professors, Students, intellectuals, আওয়ামী লীগ লীডারস–Other leaders of public opinion তাদের ধরে ধরে মারা হলো। তারপরে The Machine of war was let loose on the common people–সেখানে আপনার Populated areas, যেখানেই তারা মনে করেছে, যে এখানে একটু আওয়ামী লীগের Support আছে সেখানেই তারা ধ্বংস করিয়ে দিয়েছে। সেখানে কে আছে কে না আছে সে সমস্ত না ভেবে। যা খবর আমার কাছে এসেছে দুই চারজনের সঙ্গে আমি দেখা করেছি, যা report এসেছে–Independent observers, Foreign Correspondents, who have no stake in Pakistan, who are impartial তাঁরা যে রকম Statement দিয়েছেন তাতে মনে হয় hundreds of thousands of people have been killed এবং একজন আজ আমাকে বললেন, authentic source-এ বোধ হয় এক লাখ লোক মারা গেছে। এবং সেই যে মারণাস্ত্র যেটা, সেটা আরো জোরদার করে তোলা হয়েছে এবং সাধারণ লোককে মেরে ফেলা হচ্ছে। তো এই অবস্থায় কোন মানুষ, যার কিছুটা বিবেক আছে তারা সেটা সহ্য করতে পারে না। এবং সমস্ত মানুষ জাতির এটা প্রতিরোধ করা দরকার। এবং বালাদেশের এই যে তাদের যুদ্ধ বলুন আর যাই বলুন, যেটা পশ্চিম পাকিস্তান সরকার–it is a war against entire people–যেটা করছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। অন্ততঃ আমার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে এই মিশনের আমি Head of Mission হিসেবে, আমার এইটুকু করা দরকার যে আমি সেই বাংলাদেশের পক্ষে আমার যে ছোট্ট Voice-টা সেটা raise করা দরকার। তা আমি এতদিন ভাবছিলাম যে একটা কিছু হবে হয়তো, একটা Settlement করে ফেলবে। After all মানুষ যে এত বর্বর হতে পারে না, সে একটা জাতিকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু এখন দেখলাম যে সেটা হচ্ছে না। তারা পুরো জাতিটাকেই ধ্বংস করবে। একজন Correspondent বলেছে এটা might have a nation of slaves and prostitutes। এবং সেই ভাবেই তারা করছে। যাতে পঞ্চাশ বছরে বা একশ বছরে বাঙালী জাতি যাতে আর উঠতে না পারে। এ রকম বর্বরতা এবং তাদের aim and object যেটা। তো সেখানে আমার no other alternative–but throw my love with my people and I have done that এটা মিশন হলো।

বাংলাদেশের সরকার হয়েছে এবং গতকাল তারা শপথ নিয়েছেন। তাদের Policy formulate করেছেন বাংলাদেশ সরকার, যেটা সারা বাংলাদেশের সরকার পুরো জাতি যাকে সমর্থন করেছেন নির্বাচিত করেছেন। এখন তাদের, আনুগত্য

www.pathagar.com

দেখিয়ে যারা এখনো সমর্থন করে যাচ্ছেন সেই সরকার যেভাবে আমাকে কাজ করতে বলবেন সেই ভাবে আমি কাজ করবো। আর Moral Support যেখানে-in a cause of humanity-সেটা যদি intervention হয়, তবে সেটা যদি ভারত intervention করে তবে সেটা definitely intervention."

বেগম হোসেন আলী সেদিন তার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন "দেশের বড় বড় লীডারকে ধরে ধরে একটা একটা করে বেছে বেছে মেরেছে যাতে দেশ স্বাধীন করতে না পারে। এটাই কি ইয়াহিয়া খানের কর্তব্য? ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব আমি তোমাদের চার দফা মানবো, আমি তোমাদের ছয় দফা মানবো। মুজিবরকে বড় আশ্বাস দিয়ে বড় আশায় ওনাকে সহায়তা করলেন। সেই মতো মুজিবরও মেনে নিলেন, যে ঠিক আছে আমাদের ইয়াহিয়া খান আমাদের দেশের ভাল বাঙালীদের ভালোর জন্যে বোধ হয় করছেন। কিন্তু মুজিবর রহমান সাহেব বুঝতে পারেননি যে উনি এই ২৫ তারিখ রাত্রে এই রকম গুলিবর্ষণ করে দিয়ে চোরের মতো পালিয়ে চলে যাবে। শত সহস্র প্রাণের জান নিয়ে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়ে, সেই রক্তের স্রোত বইয়ে আসে ইন্ডিয়াতে। মাত্র কুড়ি মাইল দূরে বর্ডার। উনি জানতেন না যে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে বর্ডারের থেকে এত কাছে যে ইন্ডিয়া। উনি যদি জানতেন, তাহলে বোধ হয় এ কাজ করতেন না।

আমি ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় গিয়েছিলাম কলকাতা থেকে বেড়াতে। তারপর একদিন সোমবার রাত থেকে কারফিউ আরম্ভ হলো। কারফিউর পরে সেই প্রসেশন। মুজিবরের ছেলেরা সেই প্রসেশন করা আরম্ভ করেছে। সেই কারফিউর ভেতর ছেলেরা যখন প্রসেশান করে তখন আমার সামনে ২২টি গুলি - একটা একটা করে গুলি করে ছেলেদের হত্যা করে। আমি বসে বসে কাঁদি, আমার দু' চোখ দিয়ে বারবার করে পানি পড়ে, আর আমি গুণতে থাকি।

[কান্নায় ভেঙে পড়েন] আমি গুণতে থাকি গুলির নিশানা আমাদের দেশের বাচ্চাদের মায়ের কোলের ছেলেদের একটা একটা করে টেনে নিয়ে মারছে। আমার দুই মেয়ে তাড়াতাড়ি তিন তলার ছাদে উঠে গেল দেখতে, যে কি হচ্ছে? তখন দেখি দু' দলে লাশ নিয়ে টানাটানি, একদিকে ছেলেরা টানছে আর একদিকে মিলিটারি টানছে। টানাটানি করতে করতে তারপর Student-রা সব লাশগুলো নিয়ে যায়। তারপর চিৎকার-রক্ত চাই রক্ত চাই, পানি চাই পানি চাই, ডাক্তার ডাক্তার নার্স এ্যাম্বুলেন্স। কেউ আসে-কেউ আসে না, ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়। তারপর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায় এবং একটার পর একটা মারা যায়। তারপরের থেকেই এই রকম দিনের পর দিন রাতের পর রাতে, একটা মিনিটের জন্যও বন্ধ হয়নি। আমার মনে হয় আর হবেও না। [কান্না] ইয়াহিয়া এত পাষাণ-পাথর যে তার জানে দয়ামায়া বলে কিছু নাই। তারও নিজের আছে ছেলে মেয়ে-বউ-আত্মীয়স্বজন। তারা

www.pathagar.com

কি একদিন গুলি খাবে না? তারাও একদিন গুলি খেয়ে এভাবে মারা যাবে। আমরা এখনো গুলির আওয়াজ শুনছি। সেই রক্তস্রোত বয়ে আসছে ইন্ডিয়াতে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রাণের রক্ত। সেই রক্ত দেখে আজ আর আমি সহ্য করতে পারলাম না। না পারার জন্য আজ আমি দেশ স্বাধীন ডিক্লেয়ার্ড করে দিলাম জয়বাংলা বলে। আর আমি কি করবো? আমার এক জান যদি যায়, যাক্–আমার জানের মায়া আমি করি না। কারণ, এই জান আর কি করবো আমি? এই নিজের জানকে নিজের ওপর tortured করছি আমি। খেতে বসে খেতে পারি না–শুতে গিয়ে শুতে পারি না। নিজের জানকে দিনরাত বুঝাচ্ছি। জানি না–আল্লা আমাদের ওপর, কতখানি ইসলাম ধর্ম এই বিচার আরম্ভ করেছে। ইসলাম ধর্মের ভিতর এই লেখা নাই যে, তুমি একটার পর একটা লোকের উপর গুলি করে ইসলাম ধর্ম পালন কর। এটা ইসলাম ধর্মের ভিতরে নাই–কোরান শরীফের ভিতরে নাই–কোন হাফিজ বাইবেল–পৃথিবীর কোন জিনিসের মধ্যে–হত্যার ব্যাপারে এ জিনিসটা নাই।"

বেগম আলীর কথা বলতে গিয়ে আমার আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় বুলেটবিদ্ধ তরতাজা যুবককে 'জয়বাংলা' বলে চোখের সামনেই মরতে দেখেছি। শুনেছি বহু পুত্র-কন্যাহারা বৃদ্ধ পিতামাতার হাহাকার, স্বামীহারা স্ত্রীর আকুল কান্না। অবসর সময়ে সেদিনের কথা ভাবলে এমন অনেক ছবি আমার সামনে ভেসে ওঠে। এমনি একটি মুখ–আয়েশার।

আয়েশার কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি। কলকাতা বাংলাদেশ মিশনের নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার বেশ কয়েকদিন পর বেগম আলী আমায় একদিন টেলিফোনে বললেন, 'শীগগীর টেপরেকর্ডার নিয়া আমাদের এখানে আসেন।' ছুটলাম সেখানে। পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে দেখি মিসেস আলী বছর দশেকের একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। যেতেই বললেন, পাকিস্তানি শয়তানদের অত্যাচারের আর একটি শিকার। কিভাবে এখানে এলো জানতে চাইলে মিসেস আলী বললেন, "ওকেই জিজ্ঞেস করুন।" আমি টেপরেকর্ডার চালু করে মাইক্রোফোন ওর সামনে ধরতেই মেয়েটি আতঙ্কিত হয়ে মিসেস আলীকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলো, "ওটা কি?" মিসেস আলী ওকে বুঝিয়ে বললেন। টেপরেকর্ডার বন্ধ করে আমিও ওর সঙ্গে গল্প শুরু করলাম। নানা কথায় ওর আপনজন হবার চেষ্টা করলাম। আসলে, চোখের সামনে বাবা-মা-ভাই-বোন সবাইকে খুন হতে দেখে মেয়েটি কি রকম অস্বাভাবিক হয়ে গেছে–সব সময়েই যেন আতঙ্কে গুটিয়ে আছে। যাই হোক, কিছুটা স্বাভাবিক হলে টেপ চালিয়ে ওর নাম জিজ্ঞেস করলাম। এবারে ও ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আ-য়ে-শা।" প্রশ্ন করলাম, "বাংলাদেশে তোমার কি হয়েছিল, আমায় সব বল।" আতংক আর ভয়ে আয়েশা আবার আমার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ওকে বুঝিয়ে বললাম, "তোমার আর এখানে

www.pathagar.com

ভয় নেই। তুমি আমাদের দেশে এসেছ। এখানে ওরা আসবে কি করে? তাছাড়া আমরা এখানে সবাই আছি। ওরা এখানে ভয়ে আসতেই পারবে না।" এবার আয়েশার যেন কিছুটা আস্থা ফিরে এল। মিসেস আলীও ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক বোঝালেন। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে ও ফেলে আসা দিনের কথা বলতে শুরু করলো। কিভাবে ওর চোখের সামনেই ওর বাবা-মা-ভাই-বোন সবাইকে শয়তানরা দল বেঁধে এসে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। কিভাবে তাজা রক্তে সারাটা উঠোন ভেসে গেল। কিভাবে ওর দু'মাসের ছোট্ট বোনকে মাটিতে ওরা আছড়ে মেরে ফেললো! এখানেই শেষ নয়। ছুরি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কিভাবে ওর বাবাকে কেটে সেই জায়গায় শুকনো লঙ্কার গুড়ো আর নুন ছিটিয়ে দিয়েছে ওরা। বলতে বলতে আয়েশা আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। টেপরেকর্ডার বন্ধ করলাম। তাকিয়ে দেখি মিসেস আলী অঝোরে কাঁদছেন! মেয়েটির করুণ কাহিনী শুনে আমিও সেদিন চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। অনেকে বলেন, সাংবাদিকদের আবেগে ভেসে যেতে নেই। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় ভুলে যান, সাংবাদিকরাও রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তাদেরও আবেগ আছে, অনুভূতি আছে।

যাই হোক, আয়েশা আবার কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে ওকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি আমাদের এখানে এলে কিভাবে?" উত্তরে আয়েশা বললো, কিভাবে ওদের বাড়িতে হামলার সময় এক ফাঁকে পালিয়ে বাড়ির পাশেই ডোবাতে কচুরিপানা ভর্তি জলে ডুবে শুধু নাকটুকু ওপরে ভাসিয়ে রেখে সারাদিন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর রাতের অন্ধকারে জল থেকে উঠে ভয়ে আর আতঙ্কে ছুটতে শুরু করেছিল। বলতে বলতে আবার সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। কান্না থামলে প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য প্রশ্ন করি, "তুমি গান জানো।" আশ্চর্য! আয়েশা সংগে সংগে "হ্যাঁ" বলে গাইতে শুরু করলো–"আমার সোনার বাংলা–আমি তোমায় ভালবাসি।" তাড়াতাড়ি আবার টেপ চালালাম। দু'চার কলি গাইবার পরই কান্নায় আয়েশার গলা ধরে এলো। গান থামিয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে সে বললো, "আমি আর পারছি না।" টেপরেকর্ডার বন্ধ করে স্টুডিওতে ফিরে এলাম। মনটা খুবই বিষণ্ন ছিল। তবু করুণ কাহিনীকে যতটা ভালভাবে সম্ভব বেতারে তুলে ধরলাম। সংবাদ-বিচিত্রা প্রচারের পরেই অনেক টেলিফোন পেয়েছি। তারপরও অনেকদিন অনেক মানুষ আমার কাছে আয়েশার খোঁজ করেছেন। তাঁদের বাংলাদেশ মিশনে যোগাযোগ করতে বলেছি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ঘরে ফিরে গেছেন সে দেশের মানুষ। ফিরে পেয়েছেন তাঁদের ভিটেমাটি, কেউ কেউ বা ফিরে পেয়েছেন তাঁদের আত্মীয়-স্বজন। নতুন করে দেশকে গড়ে তোলবার কাজে ব্রতী আজ বাংলাদেশের মানুষ। আমার কিন্তু আজও জানতে ইচ্ছে করে কি হলো ছোট্ট মেয়ে আয়েশার? সে কি ফিরে গেছে

www.pathagar.com

তার জন্মভূমিতে? ফিরে পেয়েছে সে কি তার কোন আপনজন? সে কি আজ নতুন করে ঘর বাঁধতে পেরেছে–না কি হারিয়ে গেছে চিরদিনের মতো এই পৃথিবী থেকে?

পাক বাহিনীর নারকীয় অত্যাচারে সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় এক কোটি বিপন্ন মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা যে যেখান দিয়ে পেরেছেন সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছেন এপারে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই এসেছেন। তাঁদের একমাত্র অপরাধ–তাঁরা বাঙালি। পাকিস্তান বেতার কিন্তু তখনও সমানে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে–ভারতে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ হওয়ায় দলে দলে তারা পাকিস্তানে চলে আসছে। আর এই জন্যই অযথা আতঙ্কিত হয়ে সামান্য কিছু হিন্দু শরণার্থী ভারতে গেছে। তারা আরো প্রচার করে চলেছে পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য ত্রাণ শিবির ভারত থেকে চলে আসা মুসলমান শরণার্থীদের ভিড়ে ঠাসা!

পাকিস্তানী বেতারের এই মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল সীমান্তের ওপার থেকে আসা পৈশাচিক অত্যাচারের শিকার শরণার্থীদের নিজেদের কথা রেকর্ড করে এনে বেতারে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা। আমরা জানতাম বাংলাদেশের দুরাবস্থার কথা, বিপন্ন বাঙালীদের নিজেদের কথা তুলে ধরবার সব পথ তখন বন্ধ। তাই আমাদের বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে শরণার্থীদের কথা রেকর্ড করতে প্রায় প্রতিদিনই ছুটে যেতে হতো বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে। শুধু সল্ট লেক নয় পশ্চিম বাংলার সীমান্ত এলাকায় আরো অনেক ত্রাণ শিবির গড়ে উঠেছিল। এই সব নির্যাতিত শরণার্থীদের অনেকেই ছিলেন আহত, অসুস্থ এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ত্রাণশিবির ছাড়াও পশ্চিম বাংলায় বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতেও তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন অসংখ্য শরণার্থী। এক মাস দু' মাস বা ছয় মাস নয় একটি বছর এই এক কোটি ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় আর চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিল ভারত। বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষের হাহাকার প্রথমদিকে তেমনভাবে বিশ্বকে আলোড়িত করেনি। দিনের পর দিন বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে। কিন্তু মিথ্যার বেসাতি দীর্ঘদিন চালানো যায় না, সত্য একদিন প্রকাশ হবেই। পাক বাহিনীর ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা, তাদের নারকীয় তাণ্ডবের বীভৎসতা ধীরে ধীরে অনেকের বিবেককেই দংশন করতে শুরু করলো। আকাশবাণী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ভারতীয় সাংবাদিক এবং কিছু কিছু বিদেশী সাংবাদিকের প্রচেষ্টায় ক্রমেই সত্য প্রকাশিত হতে লাগলো। পাকিস্তানের অবিরাম মিথ্যা প্রচারের নির্লজ্জ প্রয়াস একদিন ধরা পড়লো।

ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ার এমনি একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ব্রিটেন থেকে এক সংসদীয় প্রতিনিধি দল ভারতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা

www.pathagar.com

শরণার্থীদের দেখতে আসছেন। উদ্দেশ্য, সরজমিনে সবকিছু খতিয়ে দেখা। এই সংসদীয় প্রতিনিধি দলটি কিন্তু ভারতে আসার আগে পাকিস্তানের মিথ্যা দাবি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানেও উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে যথারীতি সকালেই টেপরেকর্ডার নিয়ে বনগাঁ সীমান্তে পৌঁছলাম। ওখানে গিয়ে দেখি নির্দিষ্ট স্থানে আরো কিছু সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী হাজির। কিন্তু কেন জানি না, ব্রিটিশ দলনেতা ফতোয়া জারি করলেন, তারা শিবির পরিদর্শনের সময় কোন সাংবাদিককেই তাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দেবেন না। তবে তাঁরা বললেন শরণার্থীদের দেখে এসে বিকেলে তারা অবশ্যই সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করবেন।

যা বলবার তখনই তারা সাংবাদিকদের জানাবেন। এর জন্য বিকেলে নির্দিষ্ট করে সময়ও বলে দিলেন। যেহেতু আমাকে শরণার্থীদের সঙ্গে তাদের কথাবার্তাও টেপে ধরে রাখতে হবে, আমাকে এবং উপস্থিত দুই একজন আলোকচিত্রীকে তাদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো।

আমি তো ত্রাণশিবিরে ব্রিটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঘুরছি আর শরণার্থীদের সঙ্গে ওদের কথা টেপে ধরে রাখছি। যতোদূর মনে পড়ছে এই সংসদীয় দলে ৬/৭ জন সদস্য ছিলেন আর সাহায্যকারী হিসেবে ২/১ জন সরকারি অফিসার দেয়া হয়েছিল এবং এদের পক্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব প্রতিনিধিদের সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। আরো একটি সমস্যা ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ঐ সব সাধারণ মানুষের ভাষা বোঝা এবং আবার তা সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীদের ইংরেজিতে বুঝিয়ে বলা কঠিন ছিল। আমি প্রথম থেকেই প্রতিনিধিদলের নেতার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম অগণিত বিপন্ন মানুষের অসহায় অবস্থা আর কান্নাকাটি দেখে তারা সবাই মানসিকভাবে বিচলিত হয়ে উঠছেন। তাঁরা শরণার্থীদের কথা সঠিকভাবে জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে আমাকে বারে বারে প্রশ্ন করছেন। যেহেতু আমার বাড়ি ছিল বাংলাদেশে তাই ওদের ভাষা আমার ভালোই জানা ছিল। শরণার্থীদের বক্তব্যকে প্রতিনিধিদলের নেতাকে এবার ইংরেজীতে বুঝিয়ে বলতে শুরু করলাম। এইভাবে এক সময়ে দেখি আমি প্রতিনিধিদলের নেতা আর শরণার্থীদের মধ্যে দোভাষী হিসেবে কাজ করছি।

একের পর এক পাক বাহিনীর বীভৎস অত্যাচারের বিবরণ শুনে ব্রিটিশ নেতা স্বগতোক্তির মতো এক সময় বিড় বিড় করে বলছিলেন, "Impossible! Inhuman! It is genocide!" টেপ রেকর্ডার চালুই ছিল। সুযোগ বুঝে দলনেতার কাছে মাইক এগিয়ে দিয়ে জানতে চাই এখানকার শিবির পরিদর্শনে তার প্রতিক্রিয়া। দলনেতা কিন্তু সেইখানেই দ্বিধাহীনভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বললেন, "অকল্পনীয়! সহ্য করা যায় না। পাক বাহিনীর নিদারুণ অত্যাচারের সাক্ষী–এই লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থা দেখে আমরা স্তম্ভিত। এভাবে একটা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করা যায় না।"

www.pathagar.com

এবার আমি প্রশ্ন করি, "সীমান্তের ওপারের ত্রাণ শিবিরে আপনারা কি দেখে এলেন?"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে গম্ভীর মুখে তিনি জবাব দিলেন, "A few Stray dogs!" –অর্থাৎ কয়েকটি নেড়ী কুত্তা। এই ভাবেই সেদিন ব্রিটিশ দলনেতা পাকিস্তান বেতারের সমস্ত মিথ্যা অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দিয়ে মাঠে হাড়ি ভেঙে দিয়ে গেলেন। মনে আছ আমি আর সেদিন বিকেলের সাংবাদিক বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করিনি। তাড়াতাড়ি আমাদের নিজেদের গাড়িতে আকাশবাণী ফিরে এসেছিলাম। ফিরে এসেই সব রেকর্ডিং লাইনে দিল্লী পাঠিয়েছিলাম। কিছু পরেই ব্রিটিশ দলনেতার সেই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি বেতারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। রাতে অবশ্য শরণার্থীদের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় দলনেতার এই মাঠে হাড়ি ভাঙার খবরটিও সংবাদ বিচিত্রায় ভালো ভাবেই প্রচার করা হয়।

পরে জেনেছিলাম বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে ব্রিটিশ দলনেতা এভাবে স্পষ্ট করে নিজের অনুভূতি জানাননি, কিছুটা রেখে ঢেকেই তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন। এটাই স্বাভাবিক। আসলে আবেগ আর অনুভূতিতে আলোড়িত মানুষ সেই মুহূর্তে যেভাবে নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে পরবর্তী সময়ে তাকে কিছুটা সংযত হতেই হয়। আর এই জন্যই বোধ হয় মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য 'সংবাদ বিচিত্রা'র মাইক বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছিল। বিশ্ব বিবেক বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের সমর্থনে ক্রমেই সোচ্চার হতে লাগলো। শুধু আকাশবাণী নয়, শুধু ভারতীয় সংবাদপত্র নয় বিদেশের সাংবাদিকরাও নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের ওপর এই নির্মম অত্যাচারের বিবরণ বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হলেন। তাঁরা কেউ কেউ বললেন, এভাবে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে ভারতে ঠেলে পাঠানো, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর। এক কোটি মানুষের আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য চালিয়ে যাওয়া ভারতের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের এই সব ছিন্নমূল মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানালেন। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ত্রাণ সামগ্রীও আসতে শুরু করলো। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল।

এই সময়ের একটি বিষয়ের প্রতি উল্লেখ করা বোধ হয় খুবই প্রয়োজন। ওপার বাংলার বিপন্ন ভাই বোনদের যেভাবে এপার বাংলার মানুষ সেই দুঃসময়ে বুকে তুলে নিয়ে সাহায্য আর সহানুভূতির হাত প্রসারিত করেছিল তা মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যুবক-যুবতী তরুণ-তরুণী দলে দলে তখন শহরের রাস্তায়

www.pathagar.com

নেমে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন, পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন কমিটি যারা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে ত্রাণকার্য চালিয়ে গেছেন। শুধু অর্থই নয়, অন্ন-বস্ত্র-ওষুধ যে যা পারেন তাই নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এমনকি অনেক মহিলাকে তাদের নিজেদের গায়ের সোনার গয়না খুলে দিতে দেখেছি। দেখেছি শিশুদের নিজেদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ত্রাণের জন্য অর্থ সাহায্য পাঠাতে। আর এই সব সেবামূলক কাজে আরো বেশি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'সংবাদ বিচিত্রা'ও এই বিষয়ে প্রচারে এগিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে বিদেশী সাংবাদিক ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও ছুটে এসেছিলেন ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা দেখতে। এসেছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির ভাই সিনেটর কেনেডি, এসেছিলেন রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে প্রিন্স আগা খান। এদের প্রায় সবার সঙ্গেই কলকাতায় ত্রাণশিবির পরিদর্শনের সময় আমার থাকবার সুযোগ হয়েছিল। সিনেটর কেনেডিকে শরণার্থীদের শোচনীয় অবস্থা দেখে মানসিকভাবে খুবই বিচলিত দেখেছিলাম। এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে তিনি আমায় বলেছিলেন, অসহনীয়। সাধারণ নিরীহ মানুষের ওপর ব্যাপকহারে এই ধরনের আক্রমণের নিদর্শন দেখে আমি হতবাক।

হতবাক স্তম্ভিত সবাই! বিশ্ব বিবেকও ক্রমেই আলোড়িত। কিন্তু নির্বিকার পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাক বাহিনীর অত্যাচার সমানে চলেছে। বিশেষ করে শিল্পী, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার মারণখেলায় তখন তারা মেতে উঠেছে। বাংলাদেশের বহু বুদ্ধিজীবী আর শিল্পীকে পাক-বাহিনী পরিকল্পিতভাবে হত্যা করতে লাগলো। বাধ্য হয়ে ওপার থেকে এপারে চলে এলেন অনেকে। এঁদের মধ্যে শওকত ওসমান, সনজিদা খাতুন, কবরী চৌধুরী এবং জহির রায়হানের কথা আমার এই মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

ওপারের শিল্পী আর বুদ্ধিজীবীদের উপর এই পরিকল্পিত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো এপারের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। একদিকে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ধিক্কার অপরদিকে শরণার্থীদের জন্য অর্থ আর ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ, এই ছিল সেই সময়ের পশ্চিম বাংলা বিশেষ করে কলকাতা মহানগরীর মানুষ আর বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজ। আসলে, এই সময়ে মহানগরীর প্রতিটি সন্ধ্যাই হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের সাহায্যে এক একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা!

এই মুহূর্তে এমনি এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে অনেক শিল্পীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর নজরুল-পুত্র আমার সহকর্মী বন্ধু কাজী সব্যসাচী। মনে পড়ছে, অনুষ্ঠান থেকে রেকর্ড করে আনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" আর সব্যসাচীর

www.pathagar.com

কণ্ঠে 'মুজিবর তোমায় প্রণাম' নামে একটি কবিতার আবৃত্তি সেদিনের 'সংবাদ বিচিত্রা'য় প্রচার করা হয়েছিল। পরের দিন মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের একজন তরুণ আমার সঙ্গে দেখা করে। তার বক্তব্য ছিল সে প্রত্যেকটি 'সংবাদ বিচিত্রা'ই শোনে। কিন্তু গতকালই সে শুনতে পারেনি। অথচ ওর বন্ধুরা বলেছে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঐ গান আর সব্যসাচীর আবৃত্তি ছিল অসাধারণ। তার অনুরোধ ছিল যদি ঐ অনুষ্ঠানের একটি ক্যাসেট-কপি পাওয়া যেত, অন্যথায় যদি অন্তত পক্ষে একবার যদি অনুষ্ঠানটি শোনবার সুযোগ দেয়া হতো। আমি বললাম, ক্যাসেট কপি আমরা দিতে পারি না, নিয়ম নেই। তবে ওর আকুতি দেখে জানালাম, আমি আজ ব্যস্ত কাল যদি বিকেলে একবার আসতে পার তবে হয়তো তোমায় একবার শুনিয়ে দিতে পারি। হতাশ হয়ে বললো, আগামীকাল তার বাংলাদেশে যাবার কথা কাজেই সে আসতে পারবে না। পর মুহূর্তেই বললো, "আপনি ঐ অনুষ্ঠানটি রেখে দেবেন। আমি কয়েকদিন পর ফিরে এসেই আপনার কাছে আসবো।" আমি তাকে উৎসাহিত করে বললাম, তোমরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসো। আমি টেপটি নিশ্চয়ই রেখে দেব এবং তোমাকে শোনাবো। আমি অনেক দিন যত্ন করে টেপটি রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই তরুণটি আমার কাছে কোনদিন ফিরে আসেনি। অনেকদিন ভেবেছি তবে কি আমার সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুটি যুদ্ধক্ষেত্রেই চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল? বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এমনি সব সামান্য ঘটনা–এমনি সব অজানা-অখ্যাত মুখ আমার কাছে আজ অনেক বড় হয়ে ভেসে ওঠে।

এমনি অনেক বন্ধুর কথাই আজ মনে পড়ে। '৭১ সালের সেই সংগ্রামী পর্বে বাংলাদেশের অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে, পাশাপাশি একই লক্ষ্যে কাজ করবার সুযোগ হয়েছে। এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা যেমন আছেন তেমনি আছেন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সাধারণ মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন, কেউ বা পরবর্তীকালে হারিয়ে গেছেন। আবার অনেকের সঙ্গে সেদিনের সেই বন্ধুত্ব আজও অটুট রয়েছে। দুঃসময়ের বন্ধুত্বের সেই দিনগুলোর স্মৃতি আজও আমি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি। আমার এমনি এক বন্ধু বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খান। মনে পড়ে, দিনের পর দিন আমরা আকাশবাণীতে কাজের ফাঁকে কত সময় কাটিয়েছি, সেই অনিশ্চয়তায় ভরা দিনগুলোতে। আবেদ ভাই মাঝে মাঝেই আসতেন আকাশবাণীতে। কোন সময়ে হয়তো কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে, আবার কোন সময় কোন নতুন খবরের আশায় অথবা কখনো স্রেফ আড্ডা দিতে। কিন্তু সদাহাস্যময় ঐ মানুষটি এলেই যেন এক ঝলক খুসীর হাওয়ায় আমরাও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠতাম। এত সমস্যা, এত অনিশ্চয়তা কিন্তু আবেদ ভাইকে দেখেছি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য নিয়ে তাঁর মধ্যে কোন দ্বিধা দেখিনি কোনদিন। পরে জানতে পেরেছি, কি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে

www.pathagar.com

হয়েছে তাকে সে সময়ে। সল্ট লেকের শরণার্থী শিবির থেকে পায়ে হেঁটেই তাঁকে অনেক দিন আসতে হয়েছে আকাশবাণীতে। আকাশবাণী এবং স্থানীয় সংবাদপত্রে মাঝে মধ্যে লেখা দিয়ে যা কিছু সামান্য পেতেন তাই দিয়েই তাকে চলতে হয়েছে সে সময়ের কঠিন জীবন-সংগ্রামে। অথচ একদিনও আমাদের সে কথা জানতে দেননি বুঝতে দেননি। আজ অবাক হয়ে ভাবি এই অসাধারণ আত্মবিশ্বাস আর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল বলেই হয়তো বাংলাদেশের মানুষ এতবড় বিপর্যয়কে কাটিয়ে আজ মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে স্বাধীন জাতি হিসেবে দাঁড়াতে পেরেছেন।

সীমান্তের ওপার থেকে আসা লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষের অশ্রুসজল কাহিনী তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হয়েছে যাতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যেন কোনভাবে পরিবেশকে কলুষিত না করে। শত্রু পক্ষের প্ররোচণার অভাব ছিল না। তাদের অপপ্রচারের কমতিও ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য! শিবিরগুলোতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান–জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কেমন সুন্দর ভাবে দিনের পর দিন এক সঙ্গে মিলেমিশে কাটিয়েছেন। অভাব ছিল, সমস্যা ছিল কিন্তু সব দুঃখ, সব যন্ত্রণাকে সমান ভাবে ভাগ করে নিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের এক আশ্চর্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন শরণার্থী ভাইবোনেরা। সংহতির এই উজ্জ্বল নিদর্শনকেও নানা ভাবে সে সময়ে আমাদের তুলে ধরতে হয়েছে বেতারে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্ব, রহস্যে-রোমাঞ্চে ভরা উপন্যাসের মতো। একের পর এক নাটকীয় ঘটনায় আলোড়িত হচ্ছে এই উপমহাদেশ।

বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের চোরাগুপ্তা আক্রমণে জেরবার হয়ে পাক বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন বাড়িয়েই চলেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন পশ্চিম পাকিস্তানের এক অজ্ঞাত কারাগারে ফাঁসির অপেক্ষায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর পূর্ব নির্দেশ মতো তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল হক মণি, সাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, টাইগার সিদ্দিকী এমনি অনেক যুবনেতা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন।

এদিকে বাংলাদেশের প্রবীণ নেতা মৌলানা ভাসানী তখন কলকাতায়। তিনি মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন জানালেন।

এদিকে আমেরিকা ও চীন, পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই যাচ্ছে। এই সঙ্কটকালে রাশিয়া কিন্তু ভারতের পাশে দাঁড়ালো। ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ২০ বছরের এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এদিকে, পরিস্থিতি ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, শ্রীমতী গান্ধী এবং অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটলেন পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার জন্য।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনগণের সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে শ্রীমতী গান্ধী সেদিন বিভিন্ন স্থানে যে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন তার কিছু কিছু সারাংশ এখানে তুলে দেয়া হলো। খবরগুলো আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সে সময়ের বিভিন্ন সংবাদ-বুলেটিনের হেড লাইনস থেকে নেওয়া।

ব্রাসেলস-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে তা গৃহযুদ্ধ নয়–গণহত্যা।"

লন্ডনে, শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, "বাংলাদেশের মূল সমস্যাকে বিশ্ব সমাজ এড়িয়ে যেতে পারে না।"

ওয়াশিংটন-এ শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন "শেখ মুজিবর রহমানকে যদি হত্যা করা হয় তবে পাকিস্তানেরই ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি।"

প্যারিসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "যে মানুষ মুক্তি চায় মানবিক মর্যাদা দাবি করে তাকে নিপীড়নের দ্বারা স্তব্ধ করা যায় না।"

বন-এ শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধান কি হবে তা নির্ভর করবে শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশের অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর।" বাংলাদেশের বিশেষ দূত আবু সাইয়িদ চৌধুরীও রাষ্ট্রসংঘ ও লন্ডনে গিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাবে তুলে ধরেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান, বাংলাদেশে আরো সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে থাকে। আর একটি ঘটনাও ভারত-পাক সংঘাতকে নতুন মাত্রা এনে দেয়। কয়েকজন পাকিস্তানী একটি ভারতীয় বিমানকে হাইজ্যাক করে লাহোরে নিয়ে যায়। ভারত বদলা হিসেবে, পাকিস্তানী বিমান ভারতের আকাশপথে যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে, ওদের বিমানের যাতায়াতের পথ হলো শ্রীলংকার কলম্বো হয়ে। অনেক ঘুরে যাতায়াতের এই পথে অনেক সময় আর বাড়তি খরচের ধাক্কায় নতুন সমস্যায় পড়লো পাকিস্তান।

এদিকে বিশ্ব-বিবেক ক্রমেই জাগ্রত হচ্ছিল। ধীরে ধীরে পাক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছিল বিশ্বের নানা প্রান্ত। এবারে প্রমাদ গুণলো পশ্চিম পাকিস্তান। বিপদে বুদ্ধিনাশ! একটা ভুল সামলাতে দশটা ভুল করে বসে মানুষ। পাকিস্তানেরও তখন সেই দশা! হঠাৎ তারা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করে বসলো।

তারিখটি মনে আছে ৩রা ডিসেম্বর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেদিন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। পড়ন্ত বেলায় সেই জনসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন– "আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। আমরা চাই বাংলাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব সমাপ্ত হোক।"

www.pathagar.com

কিন্তু সেই আলো-আঁধার ক্ষণে শান্তির আহবানে সাড়া না দিয়ে পাকিস্তান অতর্কিতে আক্রমণ চালালো ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ৮টি বিমান ঘাঁটির ওপর। হঠাৎই মাঝপথে ভাষণ শেষ করে শ্রীমতী গান্ধী দ্রুত ফিরে গেলেন রাজভবনে এবং রাজভবন থেকে সোজা দিল্লী।

ইতিমধ্যে আকাশবাণী থেকে বারবার ঘোষিত হলো রাত ১২টায় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্য ভাষণ দেবেন।

রাত ১২-২০ মিনিট। আকাশবাণী থেকে শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করলেন ঃ

"আজ বাংলাদেশের যুদ্ধ ভারতের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এর দরুন, আমার সরকার এবং ভারতের জনগণের ওপর গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে। দেশকে এখন যুদ্ধের পথে পরিচালিত করা ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি। কিন্তু আমরা জানি যদি আমরা আমাদের গণতন্ত্রকে এবং জীবন ধারাকে রক্ষা করতে না পারি, তবে এই শান্তি চিরস্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং আজ আমরা শুধুমাত্র আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্য লড়ছি না–লড়ছি একটি মৌল আদর্শের জন্য যা এই দেশকে শক্তি জুগিয়েছে এবং একমাত্র যার ভিত্তিতে আমরা উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আক্রমণকে প্রতিহত করতেই হবে। ভারতীয় জনগণ সহিষ্ণুতা, দৃঢ়সংকল্প, শৃঙ্খলা এবং সুগভীর ঐক্যবোধ নিয়ে এই আক্রমণের মোকাবিলা করবে।

এদিকে ভারতীয় বাহিনী সতর্ক ছিল। বিনা প্ররোচনায় পাক বাহিনীর আক্রমণের সমুচিত জবাব তারা ভালো ভাবেই দিলেন। পশ্চিম সীমান্তে সুবিধা করতে না পেরে এবার তারা পূর্ব রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যতদূর মনে পড়ছে, পাকিস্তানের ৫টি 'স্যাবার' জেট বিমান পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় এলাকায় সেদিন আক্রমণের উদ্দেশ্য ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু সদাসতর্ক ভারতীয় বিমান বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ভারতীয় 'মিগ' পাকিস্তানের ঐ ৫টি 'স্যাবার' জেটকেই ধরাশায়ী করেছিল। পরের দিনই তখনকার ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম নিজে এসে কলকাতা বিমানবন্দরে এক ছোট অনুষ্ঠানে ভারতীয় মিগ বিমানের পাঁচজন সাহসী চালককে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। ঐ গর্বিত তরুণ বৈমানিকদের সাক্ষাৎকারও সেদিন সংবাদ বিচিত্রায় প্রচার করা হয়েছিল। এভাবেই পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গণেই ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলা হলো।

৬ ডিসেম্বর। প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য এ এক আশ্চর্য দিন। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন। আমাদেরই মতো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাবার সিদ্ধান্ত। নতুন দিল্লীতে লোকসভায় বেলা সাড়ে বারোটায় প্রধানমন্ত্রী এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে

www.pathagar.com

সভাকক্ষে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সমস্ত সদস্য করতালি দিয়ে টেবিল চাপড়ে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান তাঁদের 'জয় বাংলাদেশ' ধ্বনিতে সভাকক্ষ ফেটে পড়ে। এবার গড়ে উঠলো ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত ফৌজ।

এরপর দ্রুত এগিয়ে চলে ইতিহাসের অবধারিত পরিণতি। প্রতি মুহূর্তেই রণাঙ্গণের চমকপ্রদ খবর! দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে সম্মিলিত ফৌজ। জলে, স্থলে আকাশে তাদের অপ্রতিহত গতি! পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গণেই ভারত জিতেই চলেছে। পশ্চিম খন্ডে ভারতীয় বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব বাংলায় পাক-বাহিনী পর্যুদস্ত। ঢাকার পতন আসন্ন, লাহোর পিন্ডি যায় যায়।

ইয়াহিয়া খান আশায় ছিলেন–মার্কিন সপ্তম নৌবহর আর ভারতের উত্তর দিকে চীনের আক্রমণের অপেক্ষায়। বস্তুতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সময় তাদের Seventh Fleet-কে ভারত মহাসাগরে পাঠিয়েও দিয়েছিল।

কিন্তু দিল্লীর রামলীলা ময়দানে এক বিশাল জনসভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকাকে সাবধান করে দিলেন–"তোমার Seventh Fleet-কে আমি ভয় পাই না। মনে রেখো হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ভারতকে ভয় দেখানোর দিন আর নেই।"

সেই সময়ে রণাঙ্গণের নিত্য নতুন খবর দিয়ে সাজানো হতো সংবাদ বিচিত্রা। উত্তেজনায় ভরা ছিল সে সময়ের আমাদের কর্মব্যস্ত দিনগুলো। এখানে দু'টি ঘটনার কথা আজ আমার মনে পড়ছে।

রণাঙ্গণের অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে যাবার অনুমতি পেয়ে সেদিন আমি কলকাতা বিমানবন্দরে নির্ধারিত সময়ে হাজির হলাম, অবশ্যই টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে। সেখানে পৌঁছে দেখি ইতিমধ্যে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকও হাজির। আমাদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বন্ডে সই করতে হলো। তারপর ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানি ডাকোটা বিমানে যশোর এবং সেখানে একেবারে রণাঙ্গণে। কাগজের বিবরণ থেকে রণাঙ্গণের একটা ধারণা অবশ্য ছিল কিন্তু সত্যিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু সেই দিনই প্রথম। বলতে দ্বিধা নেই, ভয় একটু ছিল তবে উত্তেজনা ছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি, এই আনন্দ আর উত্তেজনায় সেদিনের ঐ ভীতিটুকু নিমেষে দূর হয়ে গেল। আমাদের সামনে পেছনে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় বাহিনীর বেশ কিছু সশস্ত্র জওয়ান। সদাসতর্ক দৃষ্টি ওদের চারিদিকে। টেপ রেকর্ডার চালিয়ে আমি, আরো কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক তাদের সঙ্গে হেঁটে চলেছি রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে। আমাদের রাস্তার এধার-ওধার যেতে বিশেষভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। কারণ তখন শত্রুপক্ষ রাস্তার দুই ধারে মাইন পুতে রেখেছে। তাছাড়া শত্রু পক্ষের 'শেল' যেকোন মুহূর্তে আছড়ে পড়বার আশঙ্কা তো আছেই! আমাদের বলা হলো প্রায় এক কিলোমিটার আগে ভারতীয় বাহিনী সাজোয়া গাড়ি নিয়ে বিনা প্রতিরোধে

www.pathagar.com

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। সেই মুহূর্তের অনুভূতি আর উত্তেজনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবু চলার পথে মাঝে মাঝে ধারাবিররণী অর্থাৎ যাকে 'স্পট কমেন্টারী' বলে, তাই দিয়ে রণাঙ্গণের একটা বাস্তব ছবি টেপে ধরে রাখবার চেষ্টা করলাম। সহযাত্রী দু' একজন বিদেশী সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করলাম। পরে সাধারণ দু' চার জন স্থানীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফিরে এলাম। সেই দিন রাতেই রণাঙ্গণের একটি ছবি বেতারে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম।

আর একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিন যশোরের পতন ঘটলো। পতন না বলে বলা উচিত হানাদার বাহিনীর কবল থেকে সেদিন যশোর মুক্ত হলো। বাংলাদেশে যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলেছে। যশোর ক্যান্টনমেন্টের যেদিন পতন হলো সেদিন আমি আকাশবাণীর প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত ছিলাম সেখানে। ভারতীয় বাহিনীকে স্বাগত জানাতে–বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সেদিন কি উল্লাস আর আনন্দ! আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই আজ পথে নেমে এসেছেন। একের পর এক ভারতীয় জওয়ানদের গাড়ি শহরে ঢুকছে আর তাকে ঘিরে জনতার সে কি উন্মাদনা! চারিদিক 'জয়বাংলা' আর 'ভারত-বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখর। মুক্তির আনন্দে পাগল মানুষের আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের অসাধারণ দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য আমার সেদিন হয়েছিল। জানি না বিদেশী কোন সৈন্যবাহিনীকে স্বদেশের মাটিতে এভাবে স্বাগত জানাবার নজীর ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা? ভবিষ্যতেও এমন বিরল দৃশ্য দেখবার অসাধারণ সৌভাগ্য আবার কখনো কারো হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

মনে পড়ছে, যশোরে ভারতীয় বাহিনীর যিনি কমান্ডার ছিলেন তাকে ছাড়া ওখানকার চার্চের আর্চবিশপ তার সাক্ষাৎকারে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীর ওপর হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের বীভৎস বিবরণ দিতে গিয়ে সেদিন চোখের জল সামলাতে পারেননি। আর মনে আছে, অনেক অনেক মুক্তিপাগল মানুষের সঙ্গে একটি ছোট কিশোরকে। আমার ধরা মাইকের সামনে সেদিন সে কিছুই বলতে চায়নি। দুই চোখ তার জলে ভাসছিল আর ক্রমাগত শুধু 'জয়বাংলা' বলে আনন্দে চিৎকার করে যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে ভারতীয় জওয়ান আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। স্থলে একটার পর একটা ঘাঁটির পতন, আকাশে পাক বিমান ঘায়েল, সাগরে পাকিস্তানী যুদ্ধ জাহাজের সলিল সমাধি–ক্রমাগত এইসব চমকপ্রদ খবর আসছে।

১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান-বাহিনী ঢাকার কাছে পাকিস্তানের ১৬টি জঙ্গী বিমানই ধ্বংস করলো। তাছাড়া ঢাকা বিমানবন্দরে এবং অন্যান্য স্থানে ভারতীয়

www.pathagar.com

বৈমানিকেরা এমনভাবে বোমাবর্ষণ করলো যাতে কোন নাগরিকের কোন ক্ষতি না হয়–শুধু সামরিক ঘাঁটি আর সরকারি বাড়িগুলোই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। আরো লক্ষ্য ছিল–কত কম ক্ষতি করে ঢাকার দখল ত্বরান্বিত করা যায়। ইতিমধ্যে টিক্কা খান কোন রকমে প্রাণ বাঁচাতে পাকিস্তানে পালিয়ে গেলেন। পূর্ব রণাঙ্গণে পাক-বাহিনীর ভার নিলেন মেজর জেনারেল নিয়াজী।

ধীরে ধীরে সম্মিলিত ফৌজের যোদ্ধারা ঢাকার চারিদিক ঘিরে ফেললো। পাক-বাহিনীর পালিয়ে যাবারও কোন পথ রইলো না।

ভারতীয় বাহিনী আর বাংলাদেশ মুক্তি-বাহিনীর সম্মিলিত ফৌজের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যানেকশ অবিলম্বে আত্মসমর্পণের জন্য পাক সেনাদের উদ্দেশ্য আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করলেনঃ

"আমাদের সেনারা চারিদিক থেকে তোমাদের ঘিরে ফেলেছে। তোমাদের আর পালাবার পথ নেই। অবিলম্বে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো নতুবা চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত হও।" জেনারেল শ্যাম মানেকশার কণ্ঠে ঘোষিত সেদিনের সেই ইতিহাসের নির্দেশ -

"Time is running up too fast! Lay down your arms before it is too late! Indian Forces have encircled you. Your fate has been sealed. The Mukti Bahini and others fighting for liberation have encircled you. They are now prepared for taking revenge for the cruelities you have perpetuated! Now, for you, the only course is to lay down your arms to Indian Forces."

অবশেষে এলো সেই স্মরণীয় দিন ১৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি দিন। ঢাকায় বুড়িগঙ্গার তীরে সূর্য তখন অস্ত যেতে বসেছে। পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনী আর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিত ফৌজের সর্বাধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিত সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন ৭১ হাজার পাক সেনা নিয়ে পাক-বাহিনীর অধিনায়ক মেজর লেঃ জেনারেল নিয়াজী। চারিদিকে মুক্তির আনন্দে উল্লসিত বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। সে এক স্মরণীয় দৃশ্য। পরাজিত পাক-বাহিনীর বন্দী সৈনিকদের বিরুদ্ধে একদিকে প্রবল ঘৃণা ও ধিক্কার অপরদিকে বিজয়ী ভারতীয় সেনা আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ঢাকায় জনতার সে কি উল্লাস!

অবশেষে এলো সেই মুহূর্তটি। লেঃ জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলেন লেঃ জেনারেল অরোর কাছে। বন্দী হলো ৭১ হাজার পাক সেনা। অবসান হলো দীর্ঘ সংগ্রামের, হানাদার বাহিনী-মুক্ত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

ভারতীয় সংসদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্মিলিত ফৌজের কাছে বিনা শর্তে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ সদস্যদের জানিয়ে ঘোষণা করলেন–

"I have an announcement to make. The West Pakistan Forces have unconditionally surrendered. [সদস্যদের উল্লাস] Dhaka is now a free capital of a free Country."

উল্লাসে ফেটে পড়লো সভাকক্ষ। বাঁধভাঙ্গা আনন্দের জোয়ার তখন সারা বাংলাদেশে। ঢাকা উল্লাস আর উচ্ছ্বাসে প্লাবিত। 'ভারত-বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ। 'ভারত-বন্ধু জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। খুশীর জোয়ার এপারেও। মনে পড়ছে, এক ফাঁকে টেপ নিয়ে ছুটেছিলাম সল্টলেকের শরণার্থীর শিবিরে। সব দুঃখ-কষ্ট, স্বজনহারানো বেদনার কথা ভুলে অসহায় মানুষগুলো আগামী দিনের স্বদেশে ফেরার সম্ভাবনায় আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের লেঃ জেনারেল নিয়াজীকে বন্দী করে ঢাকা থেকে প্রথমে নিয়ে আসা হয় ভারতের পানাগড় বিমান ঘাঁটিতে। ঢাকা বিমান বন্দরে সেই সময় লেঃ জেনারেল নিয়াজীর একটি কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, "আমি এখন বাতিল একশ' টাকার নোট।" পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু তখনও যুদ্ধ চলছে। এগিয়ে চলেছে ভারতীয় বাহিনী। শেষ আঘাত হানার জন্য তারা প্রস্তুত। পাক-বাহিনী কোণঠাসা–মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো–এতদিন যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করে যাচ্ছিল–যারা এতদিন নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল তারা সবাই যুদ্ধ বিরতির জন্য ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে মরিয়া হয়ে উঠলো। যাই হোক বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুরোধ মেনে ভারত কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলো।

এদিকে, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান তখনও পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে শেখ মুজিবের অবিলম্বে মুক্তির দাবি উঠলো। বিপর্যস্ত পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত বিশ্ব জনমতের চাপে মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লণ্ডন হয়ে স্বদেশে ফিরবেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু তাঁদের দুঃসময়ের সাথী ভারতকে তিনি ভুলতে পারেননি। তাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে স্বদেশে ফেরার পথে নতুনদিল্লীতে তিনি থামলেন। নতুনদিল্লীতে বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু সেদিন আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান বলেছিলেন,

www.pathagar.com

"I decided to stop at the historic capital of this great country on way to my Bangladesh. For, this is the least I could do to pay my personal tribute to the best friend of my people, the people of India and their government under the leadership of your magnificent Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. She is not only the leader of our men, but also mankind, who all have worked spontaneously and friendly to make my journey possible, the journey from the darkness to the light, from captivity to the freedom, from desolation to hope, and at last going back to my 'SONAR BANGLA'."

তিনি আরো বলেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি সেকুলারিজমে–আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে–আমি বিশ্বাস করি সোসালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়–শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনার আদর্শে এত মিল কেন? আমি বলি–এটা আদর্শের মিল–এটা নীতির মিল–এটা মনুষ্যত্বের মিল–এটা বিশ্ব শান্তির মিল। আমি কিছুটা আজ ইমোশনাল ... আপনারা বুঝতে পারেন আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। জয় বাংলা, জয় হিন্দ–জয় ইন্দিরা গান্ধী।"

এর আগে–ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, "হামনে ইয়ে ভারত নে ভি তিন ওয়াদা কিয়ে থে আপনে জনতা সে। পহলে তো শরণার্থী ইহা আয়ে হ্যায় ও সব ওয়াপস যায়েঙ্গে–দুসরা, ইয়ে হাম হর তরে সে মুক্তিবাহিনী কি সহায়তা করেঙ্গে–ঔর তিসরে শেখ সাহাব কো হামনে জরুর ছোড়ায়াঙ্গে জেল সে। হামনে ভি তিনো ওয়াদা পুরা কর দিয়া, ঔর আব শেখ সাহাব যা রহা হ্যায় আপনা পরিবার কে পাস, আপনি পেয়ারী জনতাকে পাস এক বড়ী চুনটিকো সামনা করনে। আপনা ইস জনতাকো ইসকো এক নয়া দেশ বানানা–এক মজবুত দেশ বানানা–এক প্রগতিশীল দেশ বানানা যাহা ধর্মনিরপেক্ষতা, লোকতন্ত্রকে আদর্শ সদা উঁচে রহেঙ্গে। তো অব উনি কি আপ সবকো তরফ সে উনকা স্বাগত করতি হু। ঔর দিল সে উনো সে বহুত হার্দিক শুভকামনায় আপকে তরফ সে উনকো–উনকো পরিবারকো বাংলাদেশকে ভবিষ্যকে লিয়ে দেতি হু। জয় বাংলা। অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে বঙ্গবন্ধু ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে, স্বদেশবাসীর সামনে হাজির হয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিছু অংশও এখানে তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না। তার স্বপ্নের সোনার বাংলার মানুষের প্রতি ছিল তার গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর অগাধ বিশ্বাস। সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে 'সবার উপর মানুষ' সত্য এই আদর্শকে সামনে রেখে এক নতুন বাংলা

www.pathagar.com

গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। লাখো লাখো মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় অভিভূত বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন–

"আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারবো না। বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যেভাবে সংগ্রাম করেছেন আমি তাদেরকে বলতে চাই আমি ফাঁসিকাষ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম যে আমার বাঙালীকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবেই। আমার যে সব ভাই আত্মবলিদান করেছে, শহীদ হয়েছে তাদের আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আজ আমার বাংলার প্রায় বিশ লক্ষ লোককে মেরে ফেলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ও প্রথম মহাযুদ্ধেও এত লোক মৃত্যুবরণ করে নাই, শহীদ হয় নাই। আমি জানতাম না আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেল ফেল আপত্তি নাই। মৃত্যুর পরে আমার লাশটা আমার বাঙালীর কাছে দিয়ে দিও এই একটা অনুরোধ করেছিলাম। আমি মুবারকবাদ জানাই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। আমি মুবারকবাদ জানাই ভারতের সামরিক বাহিনীকে, আমি মুবারকবাদ জানাই ভারতের জনসাধারণকে। আমি মুবারকবাদ জানাই রাশিয়ার জনসাধারণকে, আমি মুবারকবাদ জানাই ব্রিটিশ, জার্মানি, ফ্রান্স এসব জায়গার জনসাধারণ ও গভর্নমেন্টকে। আমি মুবারকবাদ জানাই আমেরিকার জনসাধারণকে। আমি মুবারকবাদ জানাই বিশ্ব দুনিয়ার জনসাধারণকে যারা আমার এই মুক্তির সংগ্রামকে সাহায্য করেছেন। আমার বলতে হয় এক কোটি লোক এই বাংলাদেশ থেকে ঘর বাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারতের জনসাধারণ, মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাদের খাবার দিয়েছে থাকার জায়গা দিয়েছে। তাঁকে আমি মুবারকবাদ না দিয়ে পারি না। তবে মনে রাখা উচিত বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। বাংলার মধ্যে ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। আমি বলেছিলাম যাবার আগে বাঙালী এবার তোমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবার তোমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। তোমরা পেরেছো। আমি বলেছিলাম ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করো তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরি করে সংগ্রাম করেছো। আমি আমার সহকর্মীদের মুবারকবাদ জানাই। আমার বহু ভাই, আমার বহু কর্মী আমার বহু মা বোন আজ দুনিয়ায় নাই। তাদের আমি দেখবো না। আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আবহাওয়া অনুভব করলাম। বাংলাকে আমি প্রণাম জানাই। আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি বড় ভালোবাসি। বোধ হয় তার জন্য আমায় আবার ডেকে নিয়ে এসেছ। আমি আশা করি–দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আবেদন–আমার রাস্তা নাই, আমার ঘাট

www.pathagar.com

নাই, আমার খাবার নাই, আমার মানুষ গৃহহারা সর্বহারা, আমার মানুষ পথের ভিখারী। তোমরা আমার মানুষকে সাহায্য কর। মানবতার খাতিরে তোমাদের কাছে আমি সাহায্য চাই। আমার বাংলাদেশকে তোমরা recognise করো। সঙ্গে কাজ দাও। দিতে হবে উপায় নাই দিতে হবে। আমরা হার মানবো না আমরা হার মানতে চাই না। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গজননী রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করনি'। কবি গুরুর কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে। আমার বাঙালী আজ মানুষ। আমার বাঙালী আজ দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি, এত লোক জান দেয় নাই। তাই আমি বলি আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসাবে নেতা হিসাবে নয়–প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয় আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ, মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি আমার বাংলার যুবক শ্রেণী চাকরি না পায় বা কাজ না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্র সমাজ, কর্মীবাহিনী তোমাদের মুবারকবাদ জানাই।

তোমরা রক্ত দিয়েছো, রক্ত বৃথা যাবে না। একটা কথা বাংলায় যেন আজ থেকে চুরি ডাকাতি না হয়, বাংলায় যেন আর লুটতরাজ না হয়। অন্য দেশের লোক পশ্চিম পাকিস্তানের লোক বাংলায় কথা বলে না। আজ বলছি তোমরা বাঙালী হয়ে যাও। আর আমি আমার ভাইদের বলছি তাদের উপর হাত তুলনা। আমরা মানুষ, আমরা সবাই এক।"

আজ অবসর জীবনে অনেক সময়ে বসে বসে ভাবি চেঙ্গিস খানকেও লজ্জা দেয়া পাক-বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার আর বর্বরতার কাহিনী ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মানুষকে কতটা গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল সেদিন। মানবকিতার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত রেখে এ দেশের প্রতিটি মানুষ সেদিন দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের পাশে। রাজনীতি, ভাষা, ধর্ম–সমস্ত ব্যবধান, সব ভেদাভেদ ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার আবেদন তো তেমন ভাবে প্রচার করতে হয়নি–সেদিন আয়োজন করতে হয়নি কোন মিছিল অথবা আলোচনা সভার। কোন্ অদৃশ্য যাদু বলে আমরা সেদিন জাতি ধর্ম বর্ণের সংকীর্ণ গন্ডিকে অতিক্রম করে মানবিকতার জয়-পতাকাকে তুলে ধরতে পেরেছিলাম। সগর্বে ঘোষণা করতে পেরেছিলাম আমরা সবাই মানুষ, মনুষ্যত্বই আমাদের প্রথম এবং প্রধান পরিচয়।

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা সেদিন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলাম। দুই দেশের অগণিত শহীদের মিলিত রক্তে যে মৈত্রীবন্ধন গড়ে উঠেছে ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে, বিশ্বের

www.pathagar.com

কোন শক্তিই তাকে কোনদিন ছিন্ন করতে পারবে না এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আমরা বেঁচে থাকতে চাই।

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের জন্ম। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের বাণীকে আশ্রয় করেই একটি রাষ্ট্রের আবির্ভাব। বিশ্বের ইতিহাসে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান এক বিস্ময়কর অধ্যায়, এক রোমাঞ্চকর ঘটনা, এক অনন্য নজীর।

পরবর্তীকালে দু' দশক পরে কোন এক ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ যুদ্ধের বিজয় উৎসব উপলক্ষে দূরদর্শনের জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রযোজনার কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেই অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয়েছিল। তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা–"It was an exciting scene! The whole Bangladesh were full of joy. They were overjoyed for rescuing them from invaders. We are very much satisfied that we are able to do something for liberating Bangladesh".

বাংলাদেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আর এক ভারতীয় সেনা কর্নেল সব্যসাচী মুখার্জী–

"আমরা যে ভিন্ন দুটি দেশ সেটা আমাদের সেদিন মনে হয়নি। আমরা যুদ্ধ করতে যখন বাংলাদেশে গেছি তখনও মনে হয়েছে যে আমরা আমাদের দেশের জন্যই যুদ্ধ করছি। আবার বাংলাদেশের মানুষও অন্তত সেদিন মনে করেনি আমরা ভিন্ন দেশের সৈনিক। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ আমাদের কাছে ছিল এক বিরাট সমস্যা। যুদ্ধ যত কম সময়ে পাক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে এক কোটি শরণার্থী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করাই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য।"

Lt. Col. S. Mukherjee-র জন্মস্থান ছিল ঢাকা বিক্রমপুর। তাই বাংলাদেশের স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তিনি নিজেদের সেই ভাষাতেই কথা বলতেন।

"নিজেদের ভাষায় যখন আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতাম ওরা তখন চিৎকার করে বলতো–আমাগো মানুষ আইছেরে আমাগো মানুষ আইছে।" স্বভাবতই আবেগে আপ্লুত Lt. Col. Mukherjee বললেন -

"ভারতীয় বাহিনীকে যেভাবে ওরা স্বাগত জানিয়েছিল তার তুলনা হয় না। তাদের আশা স্বপ্ন পূরণে আমরা সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। তাই তারা আমাদের ভাই-এর মতো বুকে টেনে নিয়েছিল। আমরা তো পাক-বাহিনীর মতো উপনিবেশ গড়তে যাইনি।"

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর তখনকার Inspector General শ্রী গোলকবিহারী মজুমদার।

"দুই দেশের সেনারা সেদিন ঐক্যবদ্ধ কাজ করেছে। ডক্টর ত্রিগুণা সেন এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সেদিন ত্রাণকার্যে সাহায্য করতে

www.pathagar.com

এগিয়ে এসেছিলেন। একটি লোকও সেদিন অনাহারে মরেনি, কোন সংক্রামক ব্যাধিতে কেউ মরেনি। সবার ঐকান্তিক সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।”

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী অমিতাভ চৌধুরী “মার্চ মাসে রমনা ময়দানে মুজিবের ভাষণ শুনে আমরা শিহরিত হয়েছিলাম। মুজিব বলেছিলেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। শুধু বাংলাদেশের মানুষ নয় আমরা যারা এপারে ছিলাম তারাও প্রত্যেকেই ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছিলাম। ঘরের কাছে এই যুদ্ধ আর কোন দিন দেখিনি। ৯০ লক্ষ শরণার্থী শুধু ত্রাণশিবিরেই নয় এপারের প্রত্যেক ঘরেই ওপারের শরণার্থীরা সেদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন।”

আর এক প্রখ্যাত সাংবাদিক বরুণ সেন গুপ্ত–“সেদিন ছিল বিরাট উন্মাদনা। এই যুদ্ধের ফলে আমাদের হাজার হাজার সেনা প্রাণ দিয়েছিলেন। অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। কিন্তু সবাই হাসি মুখে সব মেনে নিয়েছিল। কারণ তারা বুঝেছিল এই মুক্তিযুদ্ধে এক নতুন রাষ্ট্র, এক নতুন বাঙালী জাতির জন্ম হচ্ছে যাদের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে।”

১৯৭১ থেকে ২০০০ দীর্ঘ ২৯ বছর আমরা পেরিয়ে এসেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম প্রগিতশীল স্বাধীন রাষ্ট্রে হিসেবে স্বীকৃত, অভিনন্দিত। আমরা যারা এই দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম তারা বাংলাদেশের যে কোন সাফল্যে–তা সংস্কৃতি, শিক্ষা, ক্রীড়া অথবা রাজনীতি যেকোন অঙ্গনেই হোক–গর্ব অনুভব করি। কিন্তু হতাশ হতে হয় তখন যখন আমাদের দুই দেশের কিছু কিছু মানুষের কাছে সময় সময় অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন এপারের অনেকে প্রশ্ন করেন, “কি লাভ হলো আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার হয়ে? কেনই বা আমরা বাংলাদেশের জন্য এত রক্ত দিলাম?” কেউ কেউ আবার দুঃখ করে বলেন, “ওরা তো অনেকে আজ স্বীকারই করতে চায় না যে ওদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কোন অবদান আছে।”

আমার তো মনে হয় কোন স্বীকৃতি লাভের জন্য তো ভারত সেদিন লড়েনি। আমরা তো একটা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইতে ওদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিক দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে মানবতার জয়পতাকাকে আমরা সগৌরবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছি।

আবার ওপারের অনেককে মন্তব্য করতে শুনেছি, “ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে নিজের স্বার্থে–পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই।” কেউ কেউ আবার বলেন, “বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ী হতো। পাক-বাহিনী বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের লজ্জা এড়াতেই ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।”

রণক্ষেত্রের এমন সহজ সরল মূল্যায়ন করা হয়তো ঠিক নয়। আমার তো মনে হয়, বাংলাদেশের মতো নদী-নালায় ঘেরা অঞ্চলে এত অনায়াসে পাক-বাহিনীকে

www.pathagar.com

পর্যুদস্ত করতে পারতো না যদি না মুক্তি-বাহিনীর দামাল ছেলেরা তাদের সাহায্য করতো। আবার বাংলাদেশের মুক্তি-বাহিনীর পক্ষে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত একটি শক্তিশালী বাহিনীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করাও কঠিন ছিল যদি না ভারতীয় বাহিনী তাদের পাশে দাঁড়াতো।

সবচেয়ে বড় কথা একটা বাহিনী, তা সে যতো শক্তিশালী হোক তার পক্ষে একটি সমগ্র জাতিকে চিরদিন দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল যে তারা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে সমগ্র বাঙালী জাতিকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সৈনিকেরা রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করে ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে দেশের সাধারণ মানুষের ভূমিকাও অপরিসীম এই সহজ সত্যকে ওরা মানতে চায়নি।

৭১ সালের এই যুদ্ধে ভারতের নিজের অবস্থাটা একবার আমরা ভাবতে পারি। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তখন অস্থির। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সুবিধার নয়। আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার সমস্যাতেও বিভিন্ন এলাকা জর্জরিত। চারিদিকে যখন এই টালমাটাল অবস্থা সীমান্ত পেরিয়ে তখন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী সর্বস্ব হারিয়ে এপারে আসতে শুরু করলো। প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর বিরাট বোঝা তখন কোন সরকারের পক্ষেই সামাল দেয়া সম্ভব ছিল না–যদি না সাধারণ মানুষ এই সব বিপন্ন মানুষগুলোকে বুকে টেনে না নিতেন। আর একথাও তো আমরা ভুলতে পারি না–বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে–অগণিত মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে ভারতেরও হাজার হাজার সেনানী প্রাণ দিয়েছেন। কাজেই সেদিনের যুদ্ধে কার ভূমিকা বড় ছিল সেই প্রশ্নটা তোলা থাক না যুদ্ধ বিশারদদের জন্য।

আমরা তো জানি–অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেমন করে দুই দেশের সাধারণ মানুষ একদিন ভারত বাংলাদেশ 'ভাই ভাই' বলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছিল, কেমন করে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছিল। আমরা তো দেখেছি রণাঙ্গণে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় সেনানীদের মিলিত রক্ত স্রোতে এক আশ্চর্য মেল বন্ধন সেদিন রচিত হয়েছিল।

মৈত্রী বন্ধনের সেই অনন্য নজীর হয়তো বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আমরা? আমরা যারা এখনো বেঁচে আছি। যারা ভারত আর বাংলাদেশের মিলিত ঐতিহাসিক সংগ্রামকে কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি তারা বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেদিনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে তুলে ধরবার দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারি না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃতি তুমি বেদনা

বিশিষ্ট সাহিত্যিক অচিন্ত্য সেনগুপ্তের একটি সাক্ষাৎকার নিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার পর উনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "উপেন বাবু, আপনি ডাইরি লিখে রাখেন?" খানিকটা হতবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করি "কেন বলুন তো?" উনি হেসে সেদিন বলেছিলেন, "না, আপনার কর্মজীবনে, সমাজের নানা স্তরের মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আপনার এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে রাখলে, ভবিষ্যতে মহামূল্যবান সম্পদে পরিণত হতে পারে।" সেদিন অচিন্ত্য বাবুর এই কথায় তেমন গুরুত্ব দেইনি।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর বেতার ও দূরদর্শনে কাটিয়ে যখন অবসর জীবন যাপন করছি, তখন কিন্তু মনে হয় সত্যিই ভুল হয়ে গেছে। আজ কর্মজীবনের বহু স্মৃতি, বহু ঘটনা মাঝে মাঝে মনকে দোলা দেয়। কিন্তু বিস্মৃতির পাতায় অনেক ছবিই ঝাপসা হয়ে এসেছে। দিনক্ষণ, সময়, নামধাম স্পষ্টভাবে তেমন মনে পড়ে না। সেদিনের রোমাঞ্চকর উত্তেজনাময় দিনগুলির টুকরো টুকরো স্মৃতি মাঝে মাঝে এসে মনের মধ্যে ভিড় করে। আমি যখন আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'সংবাদ বিচিত্রার' প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলাম, তখনতো আমাদের দেশে দূরদর্শন আসেনি। প্রথমদিকে 'সংবাদ বিচিত্রা'ই ছিল বাইরে থেকে রেকর্ড করে আনা একমাত্র অনুষ্ঠান। স্বভাবতই এর জনপ্রিয়তা ছিল ভীষণ। আর সেইজন্যই বাইরে থেকে রেকর্ড করে আনা, নানা বিষয়ের উপর সাজানো, এই সংবাদ ভিত্তিক অনুষ্ঠান তৈরিতে ছিল আমার সৃষ্টির উন্মাদনা, আনন্দ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক, দুর্ঘটনা অথবা উৎসব আনন্দের মুহূর্তই হোক, আর খেলার মাঠের উত্তেজনাময় পরিবেশই হোক, সবকিছুকে নিয়ে ফুলের ডালি সাজিয়ে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সারাদিনের নানা ঘটনাবলী, স্পট থেকে রেকর্ড করে আনা শব্দচিত্র সাজানো এই সংবাদ শোনবার জন্য রাত দশটা পনেরো মিনিটে অগণিত শ্রোতা রেডিও খুলে অপেক্ষা করতেন। সর্বশেষ সংবাদের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরবার জন্য আমাদের সব সময় ঘড়ির কাঁটার পেছন পেছনই ছুটতে হতো। অনেক সময় এমন

www.pathagar.com

হয়েছে, রাত ন'টায় রেকর্ডিং করে ফিরেছি, স্টুডিওতে ঢুকে টেপে পাঁচ মিনিটের প্রোগ্রাম করে, তিনটি ভাগে পনেরো মিনিটের এই অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ঘোষকের হাতে পৌঁছে দিয়েছি। কাজের প্রতিটি মুহূর্তে ছিল উত্তেজনা, রোমাঞ্চ আর আনন্দে ভরা। আর তাই চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে কখনো কোনো ক্লান্তি অনুভব করিনি।

আমি আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগে প্রথম যোগদান করি ১৯৫৪ সালে। তখন এক নম্বর গাষ্টিন প্লেসে ছিল আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র। আমাদের দিয়েই শুরু হয় আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্র বাংলার স্থানীয় সংবাদ। আমার মনে আছে, সংবাদ পাঠক হিসেবে তখন যোগদান করেছিলেন আজকের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী সৌমিত্র চট্রোপাধ্যায়। অবশ্য কয়েকমাস বাদেই তিনি সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হওয়ায় আকাশবাণী ছেড়ে দেন। সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে প্রচারিত ঐ স্থানীয় সংবাদ বিভাগে, শুরুতে আর যাঁরা আমার সহকর্মী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট বেতার সাংবাদিক নির্মল সেনগুপ্ত আর বার্তা সম্পাদক বিভূতি বসু। অবশ্য আকাশবাণীর সেদিনের অন্যান্য জনপ্রিয় নামের মধ্যে ছিলেন, শিশু মহলের ইন্দিরাদি, মহিলা মহলের বেলাদি, গল্পদাদুর আসরের জয়ন্ত চৌধুরী, সঙ্গীত বিভাগে পঙ্কজ মল্লিক, দক্ষিণা মোহন ঠাকুর, নাট্য বিভাগের বীরেনদা অর্থাৎ বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীধর ভট্রাচার্য, বাণী কুমার এমনি অনেকে। আসলে এঁরা ছিলেন শ্রোতাদের কাছে আজকের ফিল্মী দুনিয়ার তারকাদের মতোই এক-একটি উজ্জ্বল নাম। স্বভাবতই এতগুলো জনপ্রিয় তারকার সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমার ছিল আলাদা এক অনুভূতি।

গাষ্টিন প্লেসে যে বছর আমরা ছিলাম তেমন করে বলার মতো, কিছু মনে নেই। আসলে আমাদের সংবাদ বিভাগটির সবে শুরু হলো। আর তাই অন্যান্য বিভাগ থেকে আমাদের কিছুটা দূরত্ব যেন ছিল। তাছাড়া সেদিন ১৮ বছরের তরুণের কাছে আকাশবাণীর স্টুডিও ছিল এক স্বপ্নের জগৎ। নামীদামী শিল্পীদের আনাগোনায় সদাচঞ্চল ঐ কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলোর সান্নিধ্যে যাবার ইচ্ছে থাকলেও সাহস তেমন ভাবে হয়নি সেদিন। তবু এরই মধ্যে দু'টি ঘটনা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘটনা দু'টি যদিও সামান্য তবুও পাঠকদের জানাবার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমাদের সংবাদ কক্ষটি ছিল তিন তলার এক কোণে। ঘরটির পেছনেই ছিল ছোট্ট ব্যালকনির মতো আর তার ঠিক নিচেই বিশাল এক কবরখানা।

কবরখানার দৌলতেই কিনা জানিনা, আকাশবাণীর পৌঁছবার কিছুদিন পরেই ভূতুড়ে নানা কাহিনী, বিশেষ করে সাহেব ভূতদের গল্প আমার কানে এলো। সেদিনের বুলেটিন প্রচারের দায়িত্ব ছিল সংবাদ বিভাগের। যেহেতু আমাদের কোলকাতা এবং হাওড়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে হতো, তাই আমাদের রাত তিনটে থেকেই অফিসের গাড়ি করে তুলে আনা হতো। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে সেদিন প্রথম তুলে এনে রাত তিনটেয় পৌঁছে দেয়া হলো আকাশবাণীতে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি

www.pathagar.com

চলে গেল হাওড়ায়, আর এক সহকর্মীকে আনতে। আমিতো শীতের রাতে সেই ভূতুড়ে বাড়ির তিন তলায় আমাদের নির্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে চুপচাপ বসলাম। চারিদিকে নিস্তব্ধতা, শুধু দেওয়াল ঘড়িতে 'টিক্‌টিক্' একটানা শব্দ। মনে যতই সাহস আনবার চেষ্টা করি, ততই বারেবারে আমার চোখ দু'টি চলে যায় নিচের গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা কবরখানার দিকে। মাঝে মাঝে শুনতে পাই, ঘরের বাইরে একাধিক মানুষের পদচারণার শব্দ। শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে আসে। হঠাৎ শুনতে পাই ঘরের মধ্যে পিয়ানোর টুং টাং মিষ্টি আওয়াজ। আমি আগেই শুনেছিলাম সাহেব ভূত নাকি মাঝে মাঝেই স্টুডিওতে এসে বেশী রাতে পিয়ানো বাজাতে ভালবাসেন। পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ শুনে তখন আমার কোনো ইন্দ্রিয়ই কাজ করছে না। অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে কাদের যেন ফিস্ ফাস্ আওয়াজ শুনতে পাই। চেতনা ফিরে পেলাম সহকর্মীর ডাকে। হাওড়া থেকে তাকে ততক্ষণে তুলে আনা হয়েছে।

বেশ কিছুদিন আমি সেদিনের ঘটনার কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি। কাউকে এনিয়ে কোনো প্রশ্নও করিনি। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার কার্যকারণ আমি খুঁজে পেয়েছি।

প্রভাতী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে ইঞ্জিনিয়ার সহকর্মী বন্ধুরা স্টুডিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যন্ত্রপাতি ঠিক্‌ঠাক্ আছে কিনা দেখেন। তাদেরই কেউ হয়তো পিয়ানো বাজানোর লোভ সামলাতে পারেননি আর ফিস্‌ফাস্ আলোচনা তাঁদেরই মধ্যে। আমাদের সংবাদ কক্ষের মধ্যে ছিল একটি স্পিকার সেট্। ইঞ্জিনিয়ার সংযোগ করে দিলে, আমরা সংবাদ বুলেটিন অথবা স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্মকান্ড ঐ স্পিকারের মাধ্যমে শুনতে পেলাম। ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুরা সেদিন ভুল করে বুলেটিন চালু হবার আগেই আমাদের স্পিকারের সংগে কানেকশন্ দিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই হয়ত এই 'ভূতুড়ে বিপত্তি'।

গাষ্টিন প্লেসের আরো একটি ঘটনা আমি আজও ভুলিনি। সেদিন দুপুরে দোতলায় আমি আকাশবাণীর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ঘরে বসে আছি। এমন সময় সেই ঘরের দরজায় 'ঠক্ ঠক্' আওয়াজ। কর্মকর্তাটি আমার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে গম্ভীর মুখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শোনা গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উনি হুঙ্কার ছাড়লেন, "কাম ইন"। ফাইল বগলদাবা করে একজন ভীত সন্ত্রস্ত কর্মী ভিতরে ঢুকে নীরবে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার তিনি ধমক দিয়ে বললেন, শ্যামবাজারের ষাঁড়ের মতো দরজায় এসে গুতান ক্যান্? কাম্ থাকলে ঢুইক্যা যাইতে পারেন না? কর্মী ছেলেটি কাচুমাচু হয়ে তাঁর সম্মতি জানিয়ে ফাইলে কী সই করিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি ভাবলাম এতবড় কর্মকর্তার কাছে কাজের জন্য সকলের অবারিত দ্বার। মনটা প্রসন্ন হলো আকাশবাণীর মতো জায়গায় এই উদার মনোভাবই দরকার। ভবিষ্যতে আতঙ্কিত হয়ে কাজ করবার প্রয়োজন নেই ভেবে আশ্বস্ত হলাম। হায় ভগবান! দু'দিন পরের ঘটনা। একই কর্তার

www.pathagar.com

ঘর। আগন্তুকও সেই কর্মী। আর আমিও সেইদিনের মতো ঘরে উপস্থিত। সেই ছেলেটি সেদিনের মতো দরজায় ঠক্ ঠক্ না করে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। কর্তাটি কড়া দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিগলিত হাসি হেসে বললেন, 'আসেন, আমার পাশে এই সোফাটায় বসেন।' ছেলেটি হক্‌চকিয়ে গিয়ে কিছু না বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে রইলো। এবার তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন। "একবার নক্ কইর‍্যা ঢুকতে পারেন না? অফিসের নিয়মকানুন কিছুই জানেন না দ্যাখ্‌তাচি।" ছেলেটি নীরবে চলে গেল। এবার তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন, এইসব ছেলেপুলে লইয়া অফিস চালানো যায়? সমর্থন অথবা প্রতিবাদ কি করা উচিত বুঝতে না পেরে, চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করলাম। এটি অবশ্যই একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। কিন্তু পরে দেখেছি কাজের দিক থেকে এই কর্তাটি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তাঁর রসজ্ঞানও ছিল প্রচুর। আমরা তখন আকাশবাণীতে সবাই একটি পরিবারের মতোই থাকতাম। সৃষ্টিধর্মী কাজের প্রয়োজনের জন্যই হোক অথবা তখনকার পরিবেশের জন্যই হোক, আমরা শুধু পেশাগত কারণে নয়, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার টানে এক আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম। কয়েকবছর পর আমরা ইডেনে নবনির্মিত আকাশবাণী ভবনে চলে এলাম। এখানে এসে ধীরে ধীরে আমাদের কাজের পরিধি বেড়ে গেল। স্টুডিওতে নিজের হাতে কিছু সৃষ্টি করার স্বপ্ন এতদিন দেখে এসেছিলাম তা সফল হলো। আমি ধীরে ধীরে 'সংবাদ বিচিত্রা' প্রযোজনার দায়িত্ব পেলাম।

'সংবাদ বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি তৈরি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া যাক। যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তা আনন্দেরই হোক আর বিষাদেরই হোক-যেখানে ঘটেছে বা ঘটছে, সেখানে টেপ রেকর্ডার নিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে হতো। সেখানে গিয়ে ঘটনার প্রয়োজনীয় শব্দচিত্র, কিছু কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার, তাঁদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি রেকর্ড করে ফিরে আসতে হতো স্টুডিওতে। যাতে ঘটনাটির একটি বাস্তব ছবি তুলে ধরা যায় শ্রোতাদের কাছে। স্বভাবতই বেশীর ভাগ সময়ে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে, কিছুটা পরিকল্পনা মাথায় রেখে ঘটনাস্থলে যেতে পারতাম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হঠাৎ মাইক হাতে ছুটতে হতো ঘটনাস্থলে । যেমন কোন দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের আকস্মিক মৃত্যু। আগেই বলেছি, তখন তো দূরদর্শন চালু হয়নি, আর প্রথম দিকে বেতারেও বাইরে থেকে রেকর্ড করে আনা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তৈরি অনুষ্ঠান বলতে ছিল একমাত্র "সংবাদ বিচিত্রা" আর সেইজন্যই এই অনুষ্ঠানের কাছে শ্রোতাদের দাবী ছিল অনেক। সেই দাবী মেটানোর জন্য আমাদের সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হতো। প্রস্তুত থাকতে হতো যাতে ঘটনাস্থলে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি। কারণ বিপর্যয় বা দুর্ঘটনার সেই মুহূর্তের পরিবেশ, স্থানীয় মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, এইসব বাস্তব ছবিটি তুলে ধরার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিলম্বে অনেক কিছু হারিয়ে যায়। মানুষের আবেগ, উত্তেজনা অনেকটা থিতিয়ে যায়। আর এই আবেগ উত্তেজনার

www.pathagar.com

টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে যত বেশী অনুষ্ঠানটি সাজানো যাবে, ততবেশী শ্রোতাদের মনকে নাড়া দেওয়া সম্ভব হবে। এক কথায় শ্রোতাদের সেই ঘটনাস্থলে বেতারের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস, যাতে তারা অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন।

মনে পড়ে, আসানসোলের কাছে রতিবাটি কয়লাখনির দুর্ঘটনার কথা। সেদিন বিকেলে অফিসে পৌঁছেই এক নাটকীয় সংবাদ পেলাম, কিছুদিন আগে রতিবাটি কয়লাখনিতে আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় বেশ কিছু শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় জলপ্লাবিত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কিছু শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা গেলেও কায়েকজনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। ধরেই নেওয়া হয়েছিল তারা বেঁচে নেই। কিন্তু প্রায় সপ্তাহ তিনেক বাদে আকস্মিকভাবে সেই বিধবস্ত খনির নিচে প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাড়িতে বলা নেই, তৈরি হয়েও আসিনি অথচ সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। টেপ রেকর্ডার নিয়ে ছুটলাম দুর্ঘটনাস্থলে। পৌঁছে শুনলাম, বেশ কয়েকজন শ্রমিক কয়লা খনির ১৫০/ ২০০ ফুট নিচে তখনো জীবিত আছেন। তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। রাতে কয়লাখনির নিচে নামবার অনুমতি পেলাম না।

পরদিন সকালে খনির নিচে নির্দিষ্ট এলাকাতে পৌঁছেই জীবনের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হলো। সেই নিখোঁজ শ্রমিকদের কয়েকজন তখনো জীবিত আছে বলে সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হলো ৬০/৭০ ফুট দীর্ঘ এ্যালুমিনিয়ামের পাইপ। জানা গেল, বিধ্বস্ত ঐ এলাকায় কোনোক্রমে একটি 'এয়ার পকেটে'র সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই খানেই ঐ হতভাগ্য কয়েকজন শ্রমিক বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। সরু একটি পাইপ ঢুকিয়ে প্রথমে ঐ এয়ার পকেটের জীবিত মানুষগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে। পরে অপেক্ষাকৃত আরো একটি মোটা পাইপ সেখানে ঢুকিয়ে সেই অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঐ পাইপের মধ্য দিয়ে দড়ির সাহায্যে বোতলে পানীয় জল, শুকনো রুটি পাঠানো হচ্ছে এবং যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঐ মানুষগুলোর মানসিক অবস্থার কথা একবার ভাবুন। গভীর অন্ধকারে এক টুকরো ঐ ফাঁকা জায়গা, হাটুঁজলে দাঁড়িয়ে তাঁরা একদিন নয়, দুদিন নয় দীর্ঘ ১৯ দিন অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের সামনে মৃত্যুর হাতছানি। কারণ যে কোনো মুহূর্তে ধসে চাপা পড়ে চিরদিনের জন্য সমাধি হতে পারে। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন উদ্ধারকারীদলের একজন পাইপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু গহ্বরে আটকে পড়া শ্রমিকদের সংগে কথা বলছেন। সময় নষ্ট না করে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিলাম। এপার থেকে একজন আটকে পড়া শ্রমিকদের মনোবল ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিলেন এবং তাদের কি কি প্রয়োজন জানতে চাইলেন। এবার ওপার থেকে পাইপের মধ্য দিয়েই ভেসে এলো শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর। তারপর ঐ পাইপের মধ্য দিয়েই সুতোর সাহায্যে প্রথমে শুকনো রুটি পরে বোতলে পানীয়

www.pathagar.com

জল তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো। সবকিছুই আমার টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখলাম। এইভাবে যখন একদিকে হতভাগ্য শ্রমিকদের কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে, অপরদিকে উদ্ধারকারী দলের কয়েকজন মাত্র একটি শাবলের সাহায্যে গর্ত খুঁড়ে ওদের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করে যাচেছন। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিলনা। কারণ ভয় ছিল যে কোনো সামান্য আঘাতে আবার ধস নেমে ঐ আটকে পড়া শ্রমিকেরা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতে পারেন। খনির নিচে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ঐ শ্রমিকদের বাঁচিয়ে আনার সেই মরণপণ লড়াইয়ের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমি জীবনে ভুলবো না।

অবশেষে এলো উত্তেজনার সেই চরম মুহূর্ত। শাবলের সাহায্যে সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে একে একে বের করে আনা হলো কয়েকজন অর্ধমৃত শ্রমিককে। সেই মুহূর্তে তাদের কথা বলার মতো অবস্থা ছিলনা। আর স্বাভাবিক কারণেই উপস্থিত চিকিৎসকরা সে অনুমতিও দেননি। কিন্তু পরে হাসপাতালে শুনেছিলাম তাঁদের সেই অনিশ্চয়তায় ভরা দিনগুলির কথা। আকস্মিক বিপর্যয়ে হঠাৎই তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। চারদিকে শুধু গাঢ় অন্ধকার। একফালি জায়গায় হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত কয়েকজন মানুষ। এভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটির নিচে তাঁরা ১৯ দিন কাটিয়েছেন। ঐ সময় তাদের সাথে খাবার এবং পানীয় জল ছিল না। তবে তাঁরা বলেছিলেন ঐ সময় বাচাঁর তাগিদে পায়ের নিচের জল থেকে জেলি জাতীয় মাছ ধরে কাঁচা খেতেও বাধ্য হয়েছিলেন। খনির নিচে কয়েকটি অমূল্য জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনার সেই অসাধারণ লড়াইকে আমি সেদিন তুলে এনে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছিলাম বেতারের মাধ্যমে। মনে পড়ে, 'সংবাদ বিচিত্রা'র সেদিনের সেই অনুষ্ঠান নিয়ে অসংখ্য শ্রোতা যেমন টেলিফোনে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, সংবাদপত্রেও তেমনি খনির নিচে থেকে শ্রমিকদের উদ্ধারের জীবন্ত ছবি প্রচারের জন্য প্রশংসা করা হয়েছিল। আর এখানেই তো আমার সত্যিকারের তৃপ্তি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই নাটকীয় ঘটনার ভিত্তিতে রচিত একটি নাটক পরে বহুদিন সাফল্যের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

খনি দুর্ঘটনার কথা বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে ধানবাদের কাছে চাসনালা কয়লাখনিতে পরবর্তী আর একটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা। এই দুর্ঘটনায় যতদূর মনে পড়ছে পাশের কোনো জলাশয় থেকে প্রচন্ড বেগে জল ঢুকে কর্মরত শ্রমিকদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আচমকা এতো বেশী জল প্রচন্ড বেগে ঢুকে পড়ে যে হতভাগ্য মানুষগুলো কোনো সুযোগও পায়নি নিচে থেকে উপরে উঠে আসার। খুব সম্ভব তিনশো থেকে তিনশো পঞ্চাশ জন কর্মীর সলিল সমাধি হয়েছিলো এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায়। আমাকে প্রায় একমাস থাকতে হয়েছিল ধানবাদে ঐ দুর্ঘটনার সংবাদ ও রেকর্ডিং কোলকাতায় পাঠানোর জন্য। খনির নিচে সমস্ত এলাকা জলপ্লাবিত হয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। কর্মরত শ্রমিকদের কারোরই বাঁচার সম্ভাবনা নেই এটাই প্রথম থেকে সবাই আশঙ্কা করেছিলেন। তবুও ক্ষীণ আশা ছিল, যদি কোনভাবে রতিবাটি কয়লাখনির মতো অবিশ্বাস্যভাবে কেউ বেঁচে যান। আকস্মিক এই বিপর্যয়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে প্রথমে জলপ্লাবিত খনি থেকে জল তুলে ফেলার কাজ পুরোদমে শুরু হলো। কিন্তু জলের পরিমাণ তো বিশাল। দিনের পর দিন চললো ঐ জল তোলার কাজ। এদিকে ভোর না হতেই অসংখ্য মানুষের ভিড়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই খনিমুখে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। চোখেমুখে আতংক আর উৎকণ্ঠার ছাপ, যদি কোনোভাবে প্রিয়জনেরা বেঁচে থাকেন এই ক্ষীণ আশায়। বেশ কিছুদিনের নিরলস প্রয়াসের পর খনিকে জলমুক্ত করা সম্ভব হলো। তারপর সেই নিদারুণ করুণ দৃশ্য! প্রতিদিন একের পর এক নিচ থেকে তুলে আনা মৃতদেহের মিছিল। আর প্রিয়জনের বুকফাটা আর্তনাদ। একদিন নয় , দুইদিন নয় দিনের পর দিন সেই একই দৃশ্য। একদিকে পাম্প করে জল তোলা হচ্ছে অপরদিকে শবদেহগুলিকে এক এক করে বের করে আনা হচ্ছে। প্রথমদিকে প্রতিদিন মৃতদেহের সংখ্যা ছিল অনেক। দিন যত এগিয়ে যেতে থাকে সংখ্যা ততো কমতে থাকে। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত খনিমুখে প্রিয়জনের ভিড় কমেনি। থামেনি তাঁদের আকুল কান্না। আর এই কান্নাকেই চেপে ধরে রেখে পাঠাতে হতো সর্বশেষ সংবাদের সঙ্গে 'সংবাদ বিচিত্রা'র মাধ্যমে প্রচারের জন্য।

অনেকে বলে থাকেন, সাংবাদিকদের আবেগ জড়িত হতে নেই। তাদের নির্বিকার - ভাবে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির কোন স্থান নেই। কিন্তু কাজটি কত কঠিন আমি সেই দিনগুলিতে মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছি। অনেক পুত্রহারা পিতামাতা অথবা স্বামীহারা স্ত্রীর বুকফাটা কান্না আমার বহু রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। আজও সেইসব দৃশ্য মাঝে মাঝে আমার মনকে ব্যথিত করে তোলে। সাংবাদিক হলেও তাঁরা মানুষ তাদেরও আবেগ অনুভূতি আছে।

আবেগ অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়েছে ১৯৮০ সালের ১৬ আগস্ট ইডেনে সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানের মধ্যে সেই খেলায় ইডেনে ভিড় করেছিলেন হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমী দর্শক। খেলার প্রথম থেকেই ছিল উত্তেজনা। মাঝে মাঝে দু'দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের অখেলোয়াড়ী আচরণ সেই উত্তেজনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে কিছু কর্মকর্তা আর সমর্থকদের মধ্যে। খেলার শেষদিকে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। দেখতে পেলাম ইটের ঘায়ে আহত বেশ কয়েকজন সমর্থককে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর শুরু হলো ইডেনের গ্যালারীতে দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি আর খন্ডযুদ্ধ। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে খেলা শেষ হলো। আমরা কিন্তু তখন কল্পনাও করিনি কী কলঙ্কময় এক ইতিহাস রচিত হলো কোলকাতা ময়দানে। খেলার শেষে অফিসে ফেরার পথে শুনলাম নানা গুজব। কেউ

www.pathagar.com

বললেন, বহু মানুষ মারা গেছে, অসংখ্য দর্শক আহত। সঠিক সংবাদটা জানবার জন্য ক্লাব হাউসের মেডিক্যাল ইউনিটে গেলাম। সেখানে ডাঃ সুনীল ঠাকুর আমাকে বললেন, "পারলে এখুনি আপনি পি.জি. হাসপাতালে যান। এখানে আমি আর কিছু এখন বলতে পারবো না।" তখন সন্ধ্যা সাতটা বাজে। 'সংবাদ বিচিত্রা' প্রচারিত হবে রাত ১০টা ১৫ মিনিটে। মাঠের সমস্ত রেকর্ডিং এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান এডিট করে স্ক্রিপ্ট লিখে প্রোগ্রাম তৈরি করতে সময় লাগবে ২/৩ ঘন্টা। হাতে সময় নেই, তবু বিরাট কিছু ঘটে গেছে জানতে পেরে পাশেই আকাশবাণীতে সংবাদ দিয়ে এক সহকর্মীকে নিয়ে ছুটলাম পি. জি. হাসপাতালে। সেখানে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে একজন নিয়ে গেলেন একতলার একটি ঘরে। আমি চমকে উঠলাম। সেই ঘরে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে বেশ কিছু মৃতদেহ।

জানলাম এগুলো ইডেনের খেলার মাঠ থেকেই আনা হয়েছে। ঘড়িতে দেখলাম ৭-৩০ বেজে গেছে। অথচ এখানে মৃতদেহের আত্মীয় পরিজনদের কোন ভিড় নেই। থাকবে কি করে? তাঁরা তো জানেনই না কার কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল এই খেলার মাঠে। কিন্তু প্রিয়জনদের সেই হাহাকার না পেলে কিভাবে পৌঁছে দেব শ্রোতাদের কাছে আমার সেই মুহূর্তের ক্ষোভ? কিভাবে পৌঁছে দেব অগণিত মানুষের কাছে খেলার মাঠের এই মারণ যজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ! কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিকল্পনা করে ফেললাম হৃদয়হীন মানুষের মতো ভাবনা। তবু এই নারকীয় ঘটনার যন্ত্রণা মানুষের বিবেকের কাছে পৌঁছে দিতে হলে এই সিদ্ধান্ত নেয়া ছাড়া আমার সেদিন আর কোনো উপায় ছিলনা। হাসপাতাল থেকে ফোন করলাম আকাশবাণীর সংবাদ কক্ষে। সহকর্মী বন্ধু প্রণবেশ সেনকে সংক্ষেপে সব জানিয়ে বললাম, ৭-৫০ মিনিটের বুলেটিনে সংবাদটি যেন ভালভাবে অবশ্যই প্রচারিত হয়। আমি জানতাম বেতারে খবর পেয়ে আত্মীয় পরিজনরা ছুটে আসবে।

রাত আটটায় বুলেটিন শেষ হলো। আমি আমার সহকর্মীকে নিয়ে সেই ঘরটিতে ফিরে এলাম যেখানে সারি সারি মৃতদেহগুলি শায়িত ছিল। সাদা কাপড়ে তাদের সারা শরীর ঢাকা ছিল। শুধু মুখটুকু অনাবৃত। একে একে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে হাসপাতালে। মৃতদেহগুলি শনাক্ত করণের জন্যে সারিবদ্ধ ভাবে ঐ ঘরে ঢোকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি আমার সহকর্মীকে ঘরের একপাশে টেপ রেকর্ডার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে বললাম,নির্দেশ দিলাম আমি ইসারা করলেই যেন সে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দেয়। একে একে মানুষ সারিবদ্ধভাবে মৃত দেহগুলির মুখ দেখে এগিয়ে যাচেছ। চোখে মুখে তাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার ছাপ। হঠাৎ চলমান মিছিলে থমকে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ। নির্বিকার চোখে তাকিয়ে নিচে শায়িত তরুণের দিকে। সারামুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ। আমি সহকর্মীকে নির্দেশ দিলাম টেপ রেকর্ডার চালাতে। ধীরে ধীরে যন্ত্রণাবিদ্ধ সেই বৃদ্ধটি হাঁটুমুড়ে বসে নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত ঐ তরুণের মুখটি দু'হাতে আঁকড়ে ধরলেন। কয়েকটি নীরব মুহূর্তমাত্র। তারপর ডুকরে

www.pathagar.com

কেঁদে উঠলেন। বাবারে তুই কোথায় গেলিরে? সদ্য পুত্রহারা বৃদ্ধের আর্তনাদে ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। ছুটে এলেন বাইরে অপেক্ষারতা বৃদ্ধের স্ত্রী। পুত্রহারা পিতামাতার কান্না আর সহ্য করা সম্ভব ছিলনা, আর সময়ও হাতে ছিলনা। পি. জি. হাসপাতাল থেকে ছুটে এলাম আকাশবাণীর স্টুডিওতে। পুত্রহারা মাতা পিতার আকুল আর্তনাদ দিয়ে আমি সেদিন প্রশ্ন রেখেছিলাম, তাদের এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ী কে? বিবেকবান মানুষের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, খেলার নামে এই নারকীয় তান্ডব আর কতদিন চলবে কোলকাতা ময়দানে? মানুষের কাছে সরাসরি এই প্রশ্নগুলি রাখবার জন্যে আমার প্রয়োজন ছিল পুত্রহারা বৃদ্ধের ঐ কান্না। ফুটবলপ্রেমী সকল মানুষের বিবেককে আমি হয়তো জাগাতে পারিনি, কিন্তু অনেকেরই হৃদয়কে নাড়া দিতে পেরেছিলাম সেদিন। মনে পড়ে, আকাশবাণীতে বসেই সেদিন অনুষ্ঠান শুনছিলাম। বৃদ্ধের কান্না শুরু হতেই টেলিফোন বেজে উঠলো "stop it, stop it" আপনারা কি মানুষ! "এই কান্না সহ্য করা যায় না।" একের পর এক টেলিফোন বেজে চললো। একই অনুযোগ "এভাবে কান্না প্রচার করবেন না, মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না।" সবিনয়ে বলি, "বাস্তবকে যেন কোনদিন কলুষিত করতে না পারে তার জন্য সবাই চেষ্টা করি।" বুঝতে পারি কিছুটা হলেও অনেক মানুষের বিবেকের কাছে আমি পৌঁছাতে পেরেছি। তাদের মনকে নাড়া দিতে পেরেছি। আর এখানেই আমার সৃষ্টির সার্থকতা।

সন্তানহারা পিতার আকুল আর্তনাদের কথা বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে আর এক কান্নার কথা। কিন্তু সে কান্না বেদনার ছিলনা, ছিল আনন্দের। আগেরটি যেমন ছিল পুত্রহারা পিতার বুকফাটা আর্তনাদ। এবারের ঘটনাটি হলো দীর্ঘ দিন বাদে হারিয়ে যাওয়া কন্যাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে পিতার আকুল কান্না। ঘটনাটি বলতে গেলে একটু পিছনের ইতিহাস বলা দরকার। মেয়েটির নাম জ্যোৎস্না, বছর আটেক বয়স হবে তখন। কোন কারণে বাবা বকাবকি করার অভিমানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সে। তারপর রাস্তায়, বাসে, ট্রেনে নানাপথ ঘুরতে ঘুরতে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছায়। সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে এসে কোর্টে হাজির করে। কোর্টও যথারীতি মেয়েটিকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেয়। এখানে বলা দরকার নিরাপত্তার স্বার্থে মেয়েদের তখন কারাগারের Safe custody তে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ১৯৮৫-৮৬ সাল হবে, তখন তরুণ আইনজীবী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, নিরপরাধ মেয়েদের নিরাপত্তার অজুহাতে এভাবে বছরের পর বছর কারাগারে রাখার অধিকার নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানালেন কোর্টে। মাননীয় বিচারপতি রায় দিলেন, এভাবে মেয়েদের কারাগারে রাখা যায় না। কারাগারের অন্ধকার জীবন থেকে তারা মুক্ত হলো। অনেক নিরপরাধ মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বিভিন্ন উদ্ধার অথবা অনাথ আশ্রমে। বর্তমান ঘটনার নায়িকা জ্যোৎস্নাও ছাড়া পেয়ে আশ্রয় পেল লিলুয়া হোমে। ইতিমধ্যে মেয়েটির সাত বছর জেল খাটা হয়ে গেছে। অর্থাৎ

www.pathagar.com

হারিয়ে যাওয়া জ্যোৎস্নার বয়স এখন ১৫ বছর। কিছুদিন বাদে লিলুয়া হোম থেকে জ্যোৎস্না মর্মস্পর্শী ভাষায় একখানি ছোট্ট চিঠি পাঠায় আইনজীবী শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে। মেয়েটির আবেদন ছিল, কারাগার থেকেও এই আশ্রমের জীবন তার কাছে আরো করুণ । এখান থেকে তাকে যেন উদ্ধার করে বাঁচানো হয়। শিবশঙ্কর বাবু কোন উপায় না দেখে সেই বিচারপতির কাছে চিঠিটা পেশ করেন। এদিকে মেয়েটি শুধু আদালতে তার নাম, বাবার নাম রতিকান্ত মিস্ত্রী, বাড়ি বুদবুদ বাজার এইটুকু মনে করতে পেরেছিল। আর বলেছিল তাঁর বাবা কাঠের মিস্ত্রী। মাননীয় বিচারপতি শিবশঙ্কর বাবুকেই অনুরোধ করলেন, "আপনি একবার পুলিশের সাহায্যে বুদবুদ বাজারে গিয়ে দেখুন না মেয়েটির বাবার কোন খোঁজ করতে পারেন কিনা।" পরদিনই শিবশঙ্কর বাবু পুলিশ নিয়ে গাড়ি করে মেয়েটিকে নিয়ে ছুটলেন বর্ধমানের বুদবুদে। সেখানে সারাদিন থানা-পুলিশ, স্থানীয় ক্লাব, নানা জায়গায় খোঁজ করেও হারিয়ে যাওয়া জ্যোৎস্নানার বাবা রতিকান্ত মিস্ত্রী অথবা তার বাড়ির কোন খোঁজ পেলেন না। বাধ্য হয়েই বুদবুদে রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন ভোরে ফিরে এলেন কোলকাতায়। এদিকে যেদিন জ্যোৎস্নাকে নিয়ে তার বাবাকে খুঁজতে যাওয়া হয়েছিল সেদিন ছিল সেখানকার হাটবার। হাটের পর নদী পার হয়ে অনেকেই ফিরে যাচ্ছিলেন খেয়া নৌকা করে ওপারে বাঁকুড়ায় তাদের বাড়িতে। পারাপারের সময় সবাই যখন হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির কথা আলোচনা করছিল তখনই সেই খেয়ানৌকার মাঝি শুনতে পেয়ে অধীর আগ্রহে তাদের কাছে সব জানতে চায়। আসলে ঐ মাঝিটিই হলো রতিকান্ত মিস্ত্রী। জ্যোৎস্নার বাবা। লোকমুখে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির বর্ণনা শুনে তাঁর মনে কেমন সন্দেহ হয় এই মেয়েটিই যদি তার হয়। পরদিন সকালেই সে বর্ধমানের বুদবুদে থানায় হাজির হয়। কিন্তু ততক্ষণে শিবশঙ্কর বাবু জ্যোৎস্নাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। সব কথা শুনে থানার বড়বাবু একখানা চিঠি লিখে কলকাতায় শিবশঙ্কর বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন তাকে। এদিকে জ্যোৎস্নাকে লিলুয়া হোমে রেখে, কোর্টে গিয়ে শিবশঙ্করবাবু দেখেন এক বৃদ্ধ ছোট্ট একটি পুঁটলি হাতে তার জন্য অপেক্ষা করছে। থানার বড় বাবুর চিঠিটি পড়েই শিবশঙ্কর বাবু বৃদ্ধকে নিয়ে হাজির হলেন সেই বিচারপতির কাছে। সেই বিচারপতি সব প্রশ্ন করলেন, "জ্যোৎস্না আপনারই মেয়ে প্রমাণ কি?" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন "আমার কাছে জ্যোৎস্নার রেশন কার্ড আছে আর ওর ছোটবেলার জামা কাপড় আছে। বিচারপতি তখন ৪/৫ দিন সময় দিয়ে বললেন, "আপনি সব নিয়ে আসুন। এর পরেই শিবশঙ্কর বাবু আমায় সবকিছু জানিয়ে সেই নির্দিষ্ট দিনটির কথা জানালেন। অসাধারণ একটি নাটকীয় মুহূর্ত ধরে রাখার আগ্রহে, নির্দিষ্ট দিনে বেশ কিছু আগেই টেপ রেকর্ডার নিয়ে হাজির হয়েছিলাম কোর্টে। অবশেষে এল সেই চরম নাটকীয় মুহূর্ত। বাবার সামনে হাজির করা হলো সাত বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটিকে। বৃদ্ধকে দেখেই মেয়েটি অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, 'বাবা'! সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পিতা প্রচন্ডভাবে

www.pathagar.com

চিৎকার করে উঠলো। "ওরে মারে কোথায় ছিলি এতদিন আমায় ফেলে।" চিৎকার করে কোর্টের মধ্যেই কাদঁতে কাঁদতে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার বুকে। কতক্ষণ তাঁরা কেঁদেছিল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আমরা খেয়াল করিনি। কিন্তু সেই অভাবনীয় বাবা-মেয়ের মিলনের মুহূর্ত, অনেকের চোখেই জল এনেছিল। পরে কাঁদতে কাঁদতে বাবা ও মেয়ে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া জীবনের সাতটি বছরের বেদনার কাহিনী শুনিয়েছিলেন আমাকে। মনে আছে, সেদিনের 'সংবাদ বিচিত্রা' শুরু করেছিলাম বৃদ্ধের ঐ বুকফাটা কান্না দিয়েই। তবে ধারাভাষ্যে বলেছিলাম, এ কান্না কিন্তু বেদনারই নয় আনন্দের। আর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি কান্না সে বেদনারই হোক আর আনন্দেরই হোক মানুষের মনকে নাড়া দেবেই। আর মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারলেই শ্রোতাদের কাছে প্রয়োজনীয় বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়।

রেল, বিমান, বাস এমন অনেক দুর্ঘটনা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খরা-বন্যা, ভূমিকম্প যেখানেই ঘটেছে সেখানেই ছুটে গেছি টেপ রেকর্ডার নিয়ে। রেকর্ড করে নিয়ে এসেছি সেখানকার কিছু জীবন্ত ছবি। তুলে ধরেছি শ্রোতাদের কাছে যাতে তাঁরা বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়াতে পারে, প্রসারিত করতে পারে তাদের সাহায্যের হাত। কলকাতাকে অনেকে বলে থাকেন মিছিল নগরী। নানা ঘটনাকে উপলক্ষ করে মহানগরীর রাজপথে শোভাযাত্রা ও মিছিল লেগেই আছে। কিন্তু অতীতে এমন কিছু মিছিলে সামিল হবার সুযোগ আমার হয়েছে। সেগুলিকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। মনে পড়ে বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভের কলকাতা আগমনের দিনে রাজপথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের যে ঢল নেমেছিল তাকে ঐতিহাসিক বলা যায়। বিমানবন্দর থেকে রাজ ভবনের রাস্তার দুধারের জনসমুদ্রের দুর্বার ঢেউ পেরিয়ে রাজভবন পৌঁছাতে রাশিয়া থেকে আগত ঐ দুই শীর্ষনেতার বেশ কয়েক ঘন্টা লেগেছিল। আজকের মতো তখনতো নিরাপত্তার এমন ঘেরাটোপের কড়াকড়ি ছিলনা। তাই বিদেশী অতিথিদের প্রতি অগণিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস আর অভিনন্দনের অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলো তুলে এনে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সারাক্ষণ তাদের পাশে পাশে থাকতে হয়েছিল।

আর একটি অবিস্মরণীয় মিছিলের কথা মনে পড়েছে। মিছিল না বলে শোকযাত্রা বলাই ভালো। বিপ্লবী ত্রৈলক্য নাথ চক্রবর্তীর মহাপ্রয়াণে মহানগরীর রাজপথে সেই শোকযাত্রায় সামিল হওয়ার আশ্চর্য অনুভূতি আমি কোনদিন ভুলবো না। বিপ্লবী মহারাজের মরদেহ সামনে রেখে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে চলেছেন মহা শ্মশানের দিকে। সামনের সারিতে ছিলেন অনেক জননেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী আর স্বাধীনতা সংগ্রামী। রাস্তার দু'ধারে, দু'পাশের বাড়ির ছাদে, বারান্দায় অগণিত মানুষের ভিড়। সবাই মহারাজকে শেষ প্রণাম জানতে ব্যাকুল। আমিও টেপ হাতে মহারাজের মরদেহের পিছনে পিছনে এগিয়ে চলেছি। উদ্দেশ্য বিপ্লবী সংগ্রামীর মৃত্যুতে বেদনাহত মানুষের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করে, অনুষ্ঠান প্রচার করা। নিজে কিছুটা ধারা বিবরণী

www.pathagar.com

দিয়ে, কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করে বুঝলাম এভাবে শোকাহত নীরব মিছিলের ব্যথা-বেদনার গভীরতা ধরে রাখা সম্ভব হয়। মিছিলে অনেকের সংগে সেদিন হাঁটছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর। যার কণ্ঠ, যার শব্দ চয়নের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। তার হাতে আমার ছোট্ট মাইকটি ধরিয়ে দিতে বললেন, আমি কী বলব? আমি বললাম এই মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে, চারদিকের অগণিত মানুষের চোখের জলে মহারাজকে শেষ প্রণাম জানাতে দেখে আপনার এই মুহূর্তে যে অনুভূতি আবেগ সেটাই আমি ধরে রাখতে চাই। প্রথমে কিছুটা দ্বিধা সত্ত্বেও আমার পীড়াপীড়িতে সৌমেন বাবু বলতে শুরু করলেন, আমি টেপ রেকর্ডার চালু করে দিলাম। মহা শ্মশান পর্যন্ত চলার পথে, এমনি করে মাঝে মাঝে তিনি বলে গেলেন, স্টুডিওতে ফিরে এসে তার সেই টুকরো টুকরো মনের আবেগ অনুভূতি দিয়ে আধ ঘন্টার বিশেষ সংবাদ বিচিত্রা প্রচার করা হয়েছিল। সৌমেন বাবুর আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে ধরা সেদিনের মহামিছিলের শোকের গভীরতা অগণিত শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

আর একটি শোক মিছিলের কথাও মনে পড়েছে। মহনায়ক উত্তমকুমারের আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে, ভোরেই পৌঁছে গিয়েছিলাম ভবানীপুরে তাদের বাড়িতে। কেমন করে জানিনা এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি তাদের কাছে পৌঁছল। ভোর রাত থেকে পিলপিল করে লোক আসছে তো আসছেই। এই আসার বিরাম নেই। চোখে মুখে তাদের স্বজন হারানোর বেদনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির চারিদিকে জনসমুদ্র হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, এত মানুষ, কারো মুখে কথা নেই। কোন আলোচনা নেই। আকস্মিক আঘাতে সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে।পরে, উত্তম কুমারের মরদেহ নিয়ে যখন মহাশ্মশানের পথে চলা শুরু হলো তখনো কিন্তু লাখো মানুষ তার পিছনে চলতে শুরু করলো। আর মিছিল যত এগিয়ে চলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়া মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। পথের দু'পাশে কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। বাড়ির ছাদে,বারান্দায়, গাছে, যেখানে যে জায়গা পেয়েছে সেখান থেকেই সে তাঁর প্রিয় শিল্পীকে শেষবারের মত দেখতে চায়। সেই মিছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী আর অগণিত সাধারণ চলচ্চিত্রপ্রেমী। রাস্তার দু'পাশে লাখো লাখো মানুষের মধ্যে ছিল আবাল বৃদ্ধ বণিতা, শিশু, কিশোর, কিশোরী, তরুণ, তরুণী,' যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সব বয়সের মানুষ। তাদের অনেককেই সেদিন কান্নায় ভেসে যেতে দেখেছি। দেখেছি বুক চাপড়ে চিৎকার করতে। যেন প্রত্যেকেই তাঁর একান্ত প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় কাতর। দর্শকদের হৃদয়ের মণিকোঠায় উত্তম কুমার এমনভাবে স্থান করে নিয়েছেন, এত ব্যাপক তাঁর জনপ্রিয়তা, তাঁর মৃত্যুতে অগণিত মানুষের বেদনার এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে আমি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করলাম। সেদিন সাধারণ মানুষ ছাড়াও চলার পথে যাত্রা-মঞ্চ-চলচ্চিত্র জগতের সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পী কলাকুশলী পরিচালকের প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। শুনেছিলাম সুচিত্রা সেন ভোর রাতে ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে উত্তম কুমারের

www.pathagar.com

মরদেহে মালা দিয়ে ফিরে গেছেন। আর আসেননি। বেশ কয়েকবার সেদিন বালিগঞ্জে সুচিত্রা সেনের বাড়িতে ছুটে গেছি কিন্তু প্রতিবারই দারোয়ান বলেছেন, "ম্যাডাম বাড়ি নেই।" অথচ পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি তিনি বাড়িতেই ছিলেন। হয়তো তিনি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছেন। সাক্ষাৎকার দিতে চাননি। কিন্তু পরে যখন সবার সাক্ষাৎকার এক ঘন্টার বিশেষ "সংবাদ বিচিত্রায়" প্রচারিত হলো তখন অসংখ্য মানুষ জানতে চেয়েছিলেন "কেন সুচিত্রা সেনের প্রতিক্রিয়া নেওয়া হলো না। আমাদের সমস্যা হলো এই কেন'র উত্তর লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কাছে সব সময় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও বলি, উত্তম কুমারের মৃত্যুতে সুচিত্রা সেনের প্রতিক্রিয়া না শোনানোর সেদিনের ব্যর্থতার বেদনা আজও আমি ভুলতে পারিনি। অনেক বছর পেরিয়ে গেছে উত্তম কুমার চলে যাওয়ার পর। কিন্ত তাঁর সেই অসামান্য জনপ্রিয়তা আজও অম্লান বরং মনে হয় বেড়েই চলেছে। দূরদর্শনে দেখেছি উত্তম কুমারের ছবি থাকলে দর্শকের সংখ্যা সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। বিজ্ঞাপন থেকে আয়ও হয় সব থেকে বেশী । আবার সিনেমা হলে উত্তম কুমারের ছবি এলে, দর্শকের ভিড় উপচে পড়ে। রূপালী পর্দার মায়াবী আকর্ষণে হয়তো সেদিনের দর্শক মাতোয়ারা ছিলেন কিন্তু আজকের প্রজন্মের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীও তো উত্তম কুমার বলতে অজ্ঞান। উত্তম কুমার নিয়ে কেন এই উন্মাদনা। তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূল চালিকা কী প্রশ্নটি একদিন রেখেছিলাম শিল্পীর কাছেই। উত্তরটা সরাসরি না দিয়ে হেসে বলেছিলেন "আপনারাই খুঁজে বার করুন।"

অবসর সময়ে অফুরন্ত সময়ে অনেক প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নটারও উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। এবং খুঁজতে খুঁজতে তার সান্নিধ্যে যাবার স্মরণীয় মুহূর্ত, স্মৃতির পাতা থেকে বারে বারে উঁকি দেয়।

এতবড় শিল্পী, এত বিরাট জনপ্রিয়তা কিন্তু আকাশবাণীর সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই, ব্যাপারটা আমায় অবাক করতো। শুনেছিলাম যখন তিনি উত্তম কুমার হননি অরুণ কুমার ছিলেন তখন আকাশবাণীর নাট্য বিভাগে একাধিকবার 'অডিশন' দিয়েছিলেন। কিন্তু পাশ করেননি। সেই অভিমানেই নাকি আকাশবাণীর কোন অনুষ্ঠানে পরবর্তীকালে অংশ নিতে রাজী হননি। আমার কিন্তু লক্ষ্য ছিল যে করেই হোক উত্তম কুমারকে 'সংবাদ বিচিত্রায়' প্রচার করবো।

এমনি দু'একবার কোন অনুষ্ঠানে তাঁর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু ঐসব ছোট ছোট সাক্ষাৎকার শ্রোতাদের মন ভরেনা। আমিও খুশি থাকতে পারিনি। কাজেই অনেক ভেবে চিন্তে দুই প্রজন্মের দুই খ্যাতনামা শিল্পীর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক একটি অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা মাথায় এলো। সে যুগের প্রবীণ অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী আর এযুগের জনপ্রিয় শিল্পী উত্তম কুমার। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিভাগের যখন ছাত্র ছিলাম তখনই অহীন্দ্র বাবুর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। কাজেই তাঁর সম্মতি পেতে অসুবিধা হলো

www.pathagar.com

না। কিন্তু উত্তম কুমার? বন্ধু সহকর্মী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু উত্তম কুমারের ভাই তরুণ কুমারের শরণাপন্ন হলাম। তার অনুরোধে উত্তম বাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন। সবকিছু পরিকল্পনা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে তিনি রাজি হলেন সাক্ষাৎকার দিতে। বললেন "বেশি লোক নয় শুধু আপনি আসবেন।" নির্দিষ্ট দিনে ছোট্ট একটি টেপরেকর্ডার নিয়ে হাজির হলাম উত্তম বাবুর ভবানীপুরের বাড়িতে। বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার পর তিনি সাক্ষাৎকার দিলেন, দীর্ঘ সময় ধরে। উত্তম কুমারের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার আকাশবাণীতে প্রথম প্রচারের সুযোগ পেয়ে স্বভাবতই আমি রোমাঞ্চিত। এবার তিনি বললেন, ছাইপাশ কী বললাম একটু শুনি। আমি তাড়াতড়ি টেপ গুটিয়ে শুরু থেকে চালিয়ে দিলাম। হায় ভগবান! যা রেকর্ডিং! এতবড় শিল্পী, এত ব্যস্ততা, তবুও এত বেশী সময় দিয়ে আমাকে সাক্ষাৎকার দিলেন আর আমি উত্তম কুমারের সাক্ষাৎকার প্রথম আকাশবাণী থেকে প্রচারের সুযোগ এমনভাবে হারালাম! এই অবস্থায় কি করবো ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। কি আশ্চর্য! আমার যখন এই দিশেহারা অবস্থা তখন উত্তম কুমার মৃদু হেসে বললেন, "কি রেকর্ডিং হয়নি?" আমি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে আমতা আমতা করে বললাম "না", মানে মেশিনটা ঠিক--। আমাকে শেষ করতে দিলেন না। অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে বললেন "ঠিক আছে আর একদিন আসবেন আরো ভালো করে করা হবে"। এই আমাদের উত্তম কুমার। যাঁকে এতদিন অহংকারী বলে জেনে এসেছি, কারো সঙ্গে সহজে দেখা করেন না, ভালোভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলেন না। সবকিছু ধ্যান-ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এক সহজ, সরল অমায়িক উত্তম কুমারকে সেদিন আবিষ্কার করেছিলাম। দু'দিন বাদেই আবার সেই বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ সময় তাঁর সাক্ষাৎকার রেকর্ডিং করে প্রচার করেছিলাম, অহীন্দ্র চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের সঙ্গে। মনে পড়ে উত্তম কুমারের মৃত্যুর পরেই শ্রদ্ধেয় বিমান ঘোষ এইচ, এম, ভির ক্যাসেট্ করার জন্য উত্তম কুমারের সেই সাক্ষাৎকারের খোঁজ করছিলেন। কিন্তু সেই সাক্ষাৎকারটি আকাশবাণীতে আর ছিলনা। দুর্ভাগ্য আমাদের উত্তম কুমারের কোন সাক্ষাৎকারের রেকর্ডিং আর নেই। অবশ্য এর পরেও খ্যাতনামা শিল্পী সুপ্রিয়া চৌধুরীর ময়রা স্ট্রীটের ফ্লাটে বেশ কয়েকবার গেছি। উত্তম কুমারের সাক্ষাৎকার নিয়ে এসে প্রচার করব।

মানুষ উত্তম কুমারের পরিচয় পেয়েছিলাম আরো একটি অনুষ্ঠানে। বন্যাকবলিত অসহায় বিপন্ন মানুষের সাহায্যের জন্যে বোম্বাই (মুম্বাই), কলকাতা, মাদ্রাজ চিত্র-তারকাদের নিয়ে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ইডেনে। প্রধানতঃ উত্তম কুমারের উদ্যোগেই আয়োজিত হয়েছিল ঐ আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা। অসুস্থ শরীর নিয়ে সে সময় বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মহানায়ক। ছোটাছুটির এক ফাঁকে ধরেছিলাম তাঁকে সংবাদ বিচিত্রার সাক্ষাৎকারের জন্য। হেসে তিনি বললেন, "আজ আমাকে কেন? অতিথিদের ধরুন এই বলে

www.pathagar.com

নিজেই আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে পরিচয় করিয়ে দিলেন মাদ্রাজের প্রখ্যাত চিত্র-তারকা শিবাজী গনৌশানের সাথে। শুধু তাই নয় আমার হয়ে অনুরোধ করলেন, আকাশবাণীকে কিছু বলবার জন্য। এই হলো উত্তম কুমার। যেকথা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম 'উত্তম কুমারের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ কি?' আমার তো মনে হয় শুধু সৌন্দর্য নয়, শুধু অভিনয় দক্ষতা নয়, শুধু তাঁর সেই মন ভোলানো হাসি নয়; সকলের জন্য সংবেদনশীল এই সহজ সরল অমায়িক মানুষটির আচার-আচরণও তাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। তাই আমি রূপালী পর্দার উত্তম কুমার নয়-মানুষ উত্তম কুমার কে আজও ভুলতে পারিনি।

পেশাগত প্রয়োজনে, অসংখ্য মানুষের সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে সেখানে যেমন আছেন, রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ, সাহিত্যিক, সমাজেসেবী শিক্ষাবিদ আবার সমাজের একেবারেই দুর্বল শ্রেণীর মানুষ। এদের অনেকের কথাই আজ মনে পড়ে। বিশেষ করে মনে পড়ে, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, বিধান চন্দ্র রায়, চৌ-এন-লাই, দালাইলামা, নাসের এমনি কত জননেতার কথা। ক্রীড়া জগতের দিকপাল ওয়েষ্ট ইন্ডিজের ওরেল, সোবার্স, লয়েড–সমাজসেবী মাদার টেরিসা এমনি অসংখ্য মানুষের সান্নিধ্যে এসে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁদের কাছে যাবার নানা স্মরণীয় মুহূর্ত, টুকরো টুকরো ঘটনা আমার মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

পুরুলিয়ার একটি ঘটনা মনে পড়েছে। ইন্দিরা গান্ধী সেই সময় এসেছিলেন একটি জনসভায় ভাষণ দিতে। সভায় যাবার আগে সার্কিট হাউসে তিনি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন। বাইরে তখন অসংখ্য মানুষের ভিড়। তাদের মধ্যে বেশকিছু মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে একটানা স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন। চারিদিকে উত্তেজনা, পুলিশ নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা ছোটাছুটি করে অবস্থা সামাল দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। বিক্ষোভের মাত্রা যখন বেড়েই চলেছে ইন্দিরা গান্ধী তখন দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এলেন লনে জনতার সামনে। স্লোগান আর চিৎকার বেড়েই চললো। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা আকস্মিক এই ঘটনায় দিশেহারা। ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু অচঞ্চল। হঠাৎই তিনি উঠে পড়লেন দাঁড়িয়ে থাকা একটি জীপের ওপরে। হাত তুলে জনতার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে শুরু করলেন। আমি আমার মাইকটি এক ফাঁকে তার হাতে তুলে দিয়ে টেপ রেকর্ডারটি চালিয়ে দিলাম। এবার শুরু হলো ইষ্টক বৃষ্টি। ইন্দিরা গান্ধীকে লক্ষ্য করে জনতার মধ্য থেকে কিছু দুষ্কৃতকারী ইট-পাটকেলের টুকরো ছুঁড়তে শুরু করলো। কে যেন ইটের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর মাথায় একটি ছাতা তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছাতাটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে আবেগময় অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জনতার উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর আবেগ আপ্লুত কণ্ঠের সামনে জনতার বিক্ষোভ আধা মিনিটের মধ্যেই থেমে গেল। যারা "ইন্দিরা গান্ধী মুর্দাবাদ" বলে এতক্ষণ গলা ফাটাচ্ছিলেন

www.pathagar.com

তাঁরাই এবার 'ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ' বলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললো। ছোট্ট ঘটনা, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর সেদিনের সাহসিকতা, অসীম মনোবল আর জন-আকর্ষণী শক্তি দেখে আমার মতো অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এমন একজন নেত্রীকে এই দেশেরই ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হলো!

ইন্দিরাজীর কথা বলতে গিয়ে আমার আর একটি ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সেবার উনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন অচার্য হিসেবে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে যোগদান করতে। তখন পৌষ মেলা আর সমাবর্তন অনুষ্ঠান একই সময়ে হোত। আমি জানতাম ইন্দিরাজী এক সময়ে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে বেশ কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলেন। কাজেই আমার ইচ্ছে ছিল সমাবর্তন উৎসবের ফাঁকে বাংলায় ইন্দিরাজীর একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা। পশ্চিম বাংলার তখনকার মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের শ্রী প্রীতিন ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হলাম। তিনি আমাকে কথা দিলেন যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন। ঘন্টা খানেকের মধ্যে সেই আমার ছোট্ট টেপ রেকর্ডারটি নিয়ে হাজির হলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই ইন্দিরাজী ঘর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এসে বললেন "কি বলব বলুন?"

দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে এভাবে তাঁর এই আকস্মিক প্রশ্নে প্রথমে সেদিন আমি বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে সবিনয়ে বলি, "ম্যাডাম, বাংলায় আপনার একটি ছোট্ট সাক্ষাৎকার।" উনি হেসে বললেন, "বাংলায়? আমি তো বাংলায় ভাল বলতে পারি না।" আমি বললাম, "আপনি তো এক সময়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাই পশ্চিম বাংলার মানুষ আপনার ভাষা বাংলা শুনলে খুশি হবেন।" আমার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি সেদিন সংবাদ বিচিত্রার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার বাংলায় দিয়েছিলেন। আমার বেশ মনে আছে–রেকর্ডিং শেষ হতেই তিনি বলেছিলেন, "ভাল হোল না।" অথচ যারা সেই সাক্ষাৎকারটি শুনেছিলেন তাঁদের হয়তো অনেকেরই আজও মনে আছে কত সহজ সুন্দর আর সাবলীলভাবে তিনি বড়দিন উপলক্ষে দেশবাসীর কাছে জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার আবেদন রেখেছিলেন। কিন্তু বাংলায় আরো ভালো আরো সুন্দর করে না বলতে পারার জন্য তিনি নিজে খুশি হতে পারেননি।

বেতার আর দূরদর্শনে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাজ করেছি। এর মধ্যে ২৫ বছরেরও বেশি আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে 'সংবাদ বিচিত্রা' প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলাম। বেতার সাংবাদিক হিসেবে এই সময়ে যেমন মিশতে হয়েছে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তেমনি ছুটতে হয়েছে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। এর মধ্যে আবার উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে ডুয়ার্স অঞ্চলের প্রতি রয়েছে আমার বিশেষ দুর্বলতা। কখনো স্টেট ব্যাংক, কখনো ইন্ডিয়ান অয়েল অথবা অপর কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে বারে বারে যেতে হয়েছে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। তাছাড়া ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ এই চার বছর আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রের অধিকর্তা হিসেবে কাজ

www.pathagar.com

করার সুযোগ আমার হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কথা বলতে গেলেই আমার কবিগুরুর সেই লাইন ক'টি মনে পড়ে–

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।"

সত্যি প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে এখানে। কোথাও পাহাড়, কোথাও বা সবুজ অরণ্য আবার কোথাও বা সবুজ কার্পেটে মোড়া চায়ের বাগান। আর এই সবের মাঝে মাঝে রূপোলী পাড়ের মত বয়ে চলেছে তিস্তা, ধরলা, ভোগ, জলঢাকা, মহানন্দা এমনি অসংখ্য পাহাড়ী নদী। এখানে প্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি বৈচিত্র্যে ভরা এখানকার মানুষ। কেউ পাহাড়ের, কেউ অরণ্যের আবার কেউবা সমতলের। মেচ্ রাঙ্গা, ওরাঁও, মুন্ডা টোচো নানা উপজাতি আদিবাসী-বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে বর্ণময় সাংস্কৃতিক জীবন।

জলপাইগুড়ি জেলার জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে ছোট্ট একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। বন্ধুবর প্রাক্তন ফুটবলার নীলেশ সরকারের আমন্ত্রণে স্টেট ব্যাংকের হয়ে সেবার উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম। কাজের ফাঁকে একদিন সকালে জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে উঠে আমরা সবাই গণ্ডার দেখতে বেরিয়েছিলাম। একটা হাতিতে আমি, বন্ধু ও সহকর্মী প্রণবেশ সেন আর নীলেশ। অপর দু'টি হাতিতে অন্যান্য সাংবাদিক বন্ধুরা। আমাদের হাতিটা ঘণ্টাখানেক ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গভীরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি। ভাবছি এবারে বোধ হয় আর গণ্ডার দেখা হলো না। হঠাৎ দেখি আমাদের থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এক বিরাট গণ্ডার। চিড়িয়াখানায় অবশ্য আগেই গণ্ডার দেখেছি। কিন্তু এমন কালো কুচকুচে রং-এর স্বাস্থ্যবান গণ্ডার আর দেখিনি। গণ্ডারটি তখন কেন জানি না রাগে গড় গড় করছিল আর আমাদের দিকে তাকিয়ে অনবরত পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। হয়তোবা ওর চলার পথে হঠাৎ আমরা এসে পড়ায় তার এই আক্রোশ! আমাদের অবস্থা তো তখন কাহিল! যদিও আমরা হাতির পিঠে কিন্তু সেই হাতি তো নির্বিকারচিত্তে দাঁড়িয়ে ঘাস চিবোচ্ছে। যদি গণ্ডারমশাই কোনক্রমে আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়েন! সবাই ভয়ে জড়সড়, কারো মুখে কোন কথা নেই, মানে কথা বলবার মতো মনের জোর নেই। হঠাৎ কানের কাছে শুনি নীলেশের ফিস্‌ফিসানি–"এই–অ্যা-বো-র-চা-র কত হ-বে-রে–।" ধমক দিয়ে থামিয়ে বলি, "মার না যা খুশি।" সঙ্গে সঙ্গে ওর ক্যামেরার শাটার টেপার আওয়াজ পেলাম কিন্তু ঐ একবারই! কতক্ষণ এভাবে চলছিল মনে নেই। কারণ, ভয়ে বোধ হয় আমাদের কারো বিচার-বুদ্ধি কাজ করছিল না। এদিকে যেমনি আকস্মিকভাবে গণ্ডার মহারাজ আমাদের সামনে উদয় হয়েছিলেন তেমনি রাজকীয়ভাবে মুহূর্তের মধ্যে গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা

www.pathagar.com

কিন্তু তখনও আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হতে পারছি না। আস্তে আস্তে হাতি আমাদের নিয়ে এগিয়ে চললো। হঠাৎ প্রণবেশ বলে উঠলো, "আমার চটি?" চেয়ে দেখি ওর এক পায়ের চটি নেই। ভয়ে কম্পমান অবস্থায় কখন একপাটি চটি পা থেকে খুলে নীচে পড়ে গেছে এতক্ষণ খেয়ালই করেনি। আমাদের আলোচনা আর হাসি শুনতে পেয়ে মাহুত্ তার হাতিটিকে আবার সেই জায়গাটিতে ফিরিয়ে আনলো যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা গণ্ডার দেখছিলাম। কিন্তু হায় ভগবান। এখানে ১০/১২ হাত লম্বা ঘাসের ঘন জঙ্গল। হাতি নিয়ে আমরা সবাই সেই ঘাসের বনে ডুবে যাচ্ছি। এখানে ঐ ছোট্ট চটি খুঁজে বের করা অসম্ভব। কিন্তু কি আশ্চর্য। মাহুত্ কি ইসারা করলো জানি না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঐ গভীর জঙ্গলের মধ্য থেকে ঐ চটি হাতি শুড় দিয়ে তুলে এনে আমাদের কাছে তুলে ধরলো। আর হ্যাঁ কলকাতায় ফিরে নীলেশের কাছে সেই গণ্ডারটির ছবি চেয়েছিলাম। কিন্তু জানতে পারলাম গণ্ডারের কোন ছবি ওঠেনি। নীলেশের অজুহাত–"ভয়ে হাতটা তখন এমন কাঁপছিল না ...।"

হাতির বুদ্ধির আর এক নমুনা দেখেছিলাম ঐ জলদাপাড়ার কাছেই এক বস্তিতে। হাতিরা সাধারণত বর্ষাকালে দল বেঁধে নিচে মাঝে মাঝে নেমে আসে খাবারের সন্ধানে। ঐ সময় স্থানীয় মানুষেরা হাতির উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্য টিন, পটকা নিয়ে সব সময় প্রস্তুত থাকে। সেবার সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। খাওয়াদাওয়া সেরে শোবার কথা ভাবছি। এমন সময় শুনতে পেলাম পাশের বস্তিতে তুমুল চীৎকার আর চেঁচামেচি। সেই সঙ্গে টিন পেটানো আর পটকার বিকট আওয়াজ। আমাদের দেখাশোনার ভার ছিল যার ওপর সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কি?" নির্বিকারভাবে সে জবাব দিল, "কিছু না, পাশের বস্তিতে হাতি এসেছে।" উত্তেজিত হয়ে বললাম, "হাতি দেখা যাবে?" "দেখবেন? চলুন জঙ্গলে।" বলে ছেলেটি আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে পাশের সেই বস্তিতে গেল যেখানে হাতি তাড়াতে গ্রামের মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে। সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলোতে পরিষ্কার দেখলাম একটি বিরাট হাতি নির্বিকারচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। আর দূরে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীরা টিন পেটাচ্ছে আর মাঝে মাঝে পটকা ছুঁড়ে মারছে কিন্তু অবাক কাণ্ড! যতবার তার দিকে পটকা ছুঁড়ে মারা হচ্ছে ততবারই অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটিকে মাটিতে পড়ে ফাটবার আগেই পা দিয়ে মাটিতে চেপে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। মনে হলো এটা যেন ওর কাছে একটা খেলা। ভাবটা এমনই যে মারবে? মারো কত পটকা আছে তোমাদের? এমনিভাবে এক সময়ে পটকার মজুদ ভাণ্ডার শেষ হয়ে এল টিন পেটাতে পেটাতে হাতও বোধ হয় অবশ হয়ে এল সবার। আর হাতিও বোধ হয় মানুষের শক্তির দৌড় বুঝতে পেরে খানিকটা অবজ্ঞাভরেই ধীরে ধীরে পাশের গভীর অরণ্যে ফিরে গেল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে ঘরে ফিরে এলাম।

আর একবার বকসা ব্যাঘ্র প্রকল্প দেখতে গিয়ে বাঘের সামনে পড়েছিলাম। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জয়ন্তী পাহাড়ী এলাকার

www.pathagar.com

বকসা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কয়েকটি এলাকা ঘুরে ফিরে আসছিলাম। দু'টি জীপে করে ফিরছি আমরা। প্রথম জীপটিতে আমি, ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং আমার আর এক সহকর্মী। পেছনের জীপটিতে বন্দুক হাতে একজন নিরাপত্তারক্ষী এবং আরো কয়েকজন। কাজ শেষে ফেরার তাগিদেই হয়তো আমাদের জীপটি অনেকটা এগিয়ে এসেছে। পেছনের জীপটা তখন অনেক পিছিয়ে। গভীর জঙ্গলে বেশ কিছুটা পথ চলার পর আচমকাই চালক ব্রেক কষলো। গাড়ি থেমে গেল। চালক কি যেন ইশারা করতেই আমার সঙ্গী প্রকল্প অধিকর্তা নিচে নেমে আমাকে নামতে বললেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে খানিকটা ভয়ে ভয়ে জীপ থেকে রাস্তায় নামলাম। সর্বনাশ! বেশ কয়েক গজ দূরে রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুয়ে বিরাট এক বাঘ। তার দৃষ্টি আমাদের দিকেই–কিন্তু সে দৃষ্টি ভাবলেশহীন। কিন্তু আমার তো 'হার্টফেল' করার মতো অবস্থা! পেছনের জীপটিরও দেখা নেই। আমার সঙ্গী ইশারা করে অভয় দিলেও আমি জীপে উঠতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু পায়ে তো কোন শক্তি নেই। কে যেন মাটির সঙ্গে পা দু'টিকে বেঁধে রেখেছে। ভাগ্য ভাল আমার, হঠাৎ-ই ব্যাঘ্র মহোদয় উঠে আমাদের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে একলাফে পাশের গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মহারাজার এমন রাজকীয় প্রস্থান আমার বহুদিন মনে থাকবে। পরে অবশ্য সঙ্গী ভদ্রলোকটি আমায় বলেছিলেন, "উত্তরবঙ্গের বাঘ অত্যন্ত নিরীহ, হিংস্র নয়। মানুষখেকো তো নয়ই।"

আরে বাঘ বাঘই! তার আবার আমিষ আর নিরামিষ আহারী কি? বিশেষ করে বাঘের সামনে পড়ে তখন কি ভাববার মতো মনের অবস্থা থাকে যে কে হিংস্র আর কে নিরীহ?

বাঘের কথা উঠলেই সুন্দর বনের কথা মনে পড়বেই। এই শ্বাপদ-সংকুল সুন্দরবনে আমি বহুবার গেছি–গভীর জঙ্গলে বহু রাত কাটিয়েছি। সেখানে কুমীর দেখেছি, সাপ দেখেছি, আরো অনেক জন্তু-জানোয়ার দেখেছি। কিন্তু সেই রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন কিন্তু একবারও আমি পাইনি। অথচ বকসা ফরেস্টে একবার গিয়েই তার দেখা পেলাম।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আর এক অপরূপ ভাণ্ডার হলো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামানে আমি বার ছয়েক গেছি। কিন্তু যতবারই গেছি ততবারই এর নয়ন ভোলানো রূপ আমায় নতুন করে মুগ্ধ করেছে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আশেপাশের মাত্র কয়েকটি দ্বীপে যাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত সমগ্র এলাকা এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনধারা দেখতে গেলে অন্ততঃ কয়েকমাস আপনাকে আন্দামানে কাটাতে হবে। কারণ, পোর্ট ব্লেয়ারের সঙ্গে এখনও অনেক দ্বীপের নিয়মিত যোগাযোগই নেই। আবার অনেকগুলির সঙ্গে সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন মাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। অবশ্য বর্তমানে নিশ্চয়ই যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

www.pathagar.com

যে কথা বলছিলাম–কেন বারে বারে আন্দামান আপনাকে আকর্ষণ করবে? আসলে সমুদ্র অনেক জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। আর ইচ্ছে করলে পাহাড়েও আপনি ছুটে যেতে পারেন। কিন্তু সমুদ্রের এমন বর্ণময় রূপ আর সেই স্বচ্ছ নীল জলরাশির মধ্য থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসা সবুজ পাহাড়ের হাতছানিকে আপনার পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রথম যেবার আমি আন্দামানে যাই তখন শুধু আমার অবাক হবার পালা। সত্যি কথা বলতে কি আন্দামান সম্পর্কে আমার চিরাচরিত ধারণার সঙ্গে মিল খুঁজে না পাওয়াতেই এই বিস্ময়। আমার ধারণা ছিল কালাপানির ওপারে বহু দূরে জন্তু-জানোয়ারে ভরা এই দ্বীপ মানুষের বসবাসের অযোগ্য বলেই এখানে কয়েদীদের চির নির্বাসনে পাঠানো হতো। দেশ স্বাধীন হবার পর অবস্থার নিশ্চয়ই কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সাগর আর সবুজ পাহাড়ের এমন মনমাতানো রূপ দেখতে পাবো বলে আমি আশা করিনি। সবচেয়ে অবাক হলাম যখন দেখলাম, আমাদের মতোই অনেক মানুষ বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মানুষ সেখানে দিব্যি চাষ আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ সুখেই আছেন। একদিন ভারি এক মজার ব্যাপার হলো। পোর্টব্লেয়ার থেকে বেশ দূরে কয়েকটি এলাকা দেখতে বেরিয়েছি। হঠাৎ এক জায়গায় শুনতে পেলাম পূর্ব বাংলার ভাষায় মেয়েদের সমবেত কণ্ঠে বিয়ের গান। আমরা তো কোলকাতায় এখন পূর্ব বাংলার সেই বিয়ের গান আর শুনতে অভ্যস্ত নই। স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে গাড়ি থামাতে বললাম। গাড়ি থেকে নেমে সেই বাড়িটি খুঁজে বার করলাম। দিনটা ছিল বিয়ের আগে মেয়ের গায়ে হলুদ। গানের একটি লাইন আমার আজও মনে আছে–"হলুদ গুইল্যা বাইটা আনো" ইত্যাদি। আশ্চর্য পশ্চিম বাংলায় তো আরো বেশি উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলা থেকে এসে নতুন করে জীবন শুরু করেছেন। কিন্তু সেখানেও তো এই গান আর তেমনভাবে শোনা যায় না। আমরা কেমন করে এত সহজে আমাদের সেই গ্রামীণ সংস্কৃতিকে হারিয়ে ফেললাম। অথবা শহরের কৃত্রিম জীবনধারায় আমাদের সেই সহজ-সরল গ্রামীণ সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে আমরা সঙ্কুচিত। অথচ প্রকৃতির এই খোলামেলা পরিবেশে মনের সেই অবরুদ্ধ উৎস আবার বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতো চারিদিকে আছড়ে পড়ছে। আরো মজার ব্যাপার! শহর থেকে আসা এই মানুষগুলোকে দেখে তাদের আনন্দে ভেসে যাওয়া থমকে গেল না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তারা মেতে উঠলেন। এক সময়ে দেখলাম আমরাও সেই উৎসবের অংশীদার হয়ে পড়েছিঁ। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। যেখানে এখনও কৃত্রিমতার ছোঁয়া লাগেনি সেখানে পরিচিত অপরিচিতের ভেদাভেদ থাকে না। মানুষ মানুষকে কত সহজেই না আপন করে নিতে পারে।

আর একবার আন্দামানে আমরা ট্রলারে করে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা দেখতে গেছি। বন্দর থেকে ৫০ কিলোমিটারের বেশি দূরে গভীর সমুদ্রে জাল ফেলা হয়েছে। যখন ধীরে ধীরে সেই জালকে গুটিয়ে ট্রলারের কাছাকাছি আনা হলো তখন দেখি

www.pathagar.com

সেই জালে পোনা জাতের অসংখ্য সামুদ্রিক মাছ। নীল স্বচ্ছ জল একেবারে মাছে মাছে সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু মাছভর্তি সেই জালের বাইরে পেছন পেছন আসছে এক ঝাঁক হাঙ্গর। তারা ঐ জালের ছোট ছোট মাছ খেতে খেতে আসছে। আমাদের ট্রলারের কয়েকজন কর্মী একটি শক্ত দড়িতে বড় একটা বড়শিতে মাছ গেঁথে সেই হাঙ্গরের ঝাঁকে ফেলে দিলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই বড়শিতে গেঁথে জাহাজে টেনে তুললো বিরাট এক হাঙ্গর মাছ। পরে যখন সেই মাছভর্তি জাল জাহাজে তোলা হলো তখন দেখা গেল কয়েক মণ মাছ এক টানেই উঠে এসেছে। সেদিন ফেরার পথে আরো একটি নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। মাঝপথে দেখলাম আমাদের জাহাজের পাশে পাশে চলেছে একঝাঁক ডলফিন। বেশ কয়েক কিলোমিটার পথ এই ডলফিনের দল আমাদের সঙ্গ দিয়েছিল। মাঝে মাঝেই ওরা কেউ লাফিয়ে উঠে যেন ওদের আনন্দ প্রকাশ করছিল। কেউ কেউ আবার ওদের মধ্যে আগে আগে ছুটে গিয়ে যেন আমাদের পথ দেখাতে চাইছিল।

বিভিন্ন এলাকার নানা ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ছে এক পাহাড়ী তরুণীর কথা। দুর্বল শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেবার যে কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল তা দেখাবার জন্য স্টেট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন দার্জিলিং জেলার ছোট পুরাং-এ। ঐ এলাকার মানুষের সহজ-সরল ব্যবহার আর আন্তরিক আপ্যায়নে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন ওদেরই একজন হয়ে গেলাম। ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা রেকর্ড করার পর আমি সেই নেপালী তরুণীটিকে জিজ্ঞেস করলাম সে গান গাইতে পারে কি না? উদ্দেশ্য ছিল ওদের নিজস্ব সংস্কৃতির কিছু ছবি তুলে ধরা। আমাকে অবাক করে কোন রকম দ্বিধা না করেই সে পরিষ্কার বাংলায় গেয়ে উঠলো 'হিমেল রাতের ঐ গগনের দীপগুলি'। সেদিন শীতের সন্ধ্যায় কি ভেবে সে গুরুদেবের ঐ গানটি গেয়েছিল জানি না, আমার কিন্তু মনে হয়েছিল গুরুদেব ওর মতো কোন পাহাড়ী তরুণীকে এমনি কোন শীতের রাতে দেখেই গানটি লিখেছিলেন। গান শেষ হবার পর বেশ কিছু সময় আমরা কেউ কোন কথা বলতে পারিনি। সেই গানের আবেশ আজও আমি ভুলতে পারিনি। মাঝে মাঝে ভাবি রাজনীতির আবর্তনে আমাদের সেই সহজ-সরল জীবন যেখানে কোন হিংসা নেই ভেদাভেদ নেই, আছে শুধু মানুষে মানুষে ভালোবাসা–কোথায় হারিয়ে গেল! ভাবি যদি কোনদিন এমন ছোট পুরাং-এ যাই তেমনি করে কি সেখানকার পাহাড়ী ভাই-বোনেরা আমাকে আপন করে কাছে টেনে নেবেন, তেমনিভাবে কি কোন তরুণী স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠবে "হিমেল রাতের ঐ গগনের দীপগুলি"।

রবীন্দ্র সংগীতের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়লো বিশিষ্ট শিল্পী এম. এস শুভলক্ষ্মীর কথা। সেবার তিনি এসেছিলেন শান্তি নিকেতনে 'দেশিকোত্তম' উপাধি গ্রহণের জন্য। অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যায় হাজির হলাম তাঁর কাছে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য। সাক্ষাৎকার রেকর্ডিং শেষ হবার পর আমাদের অনুরোধে তিনি সেদিন কয়েকটি

www.pathagar.com

রবীন্দ্র সংগীত গেয়েছিলেন যার মধ্যে একটি এখনও আমার কানে বাজে "আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম ধরেছে কলি"। নিজের আস্তানায় ফিরে এসে রেকর্ডিং শুনতে গিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যই হোক অথবা ক্যাসেটের জন্যই হোক রেকর্ডিং পরিষ্কার হয়নি। সাক্ষাৎকারটি যদিও বা প্রচার করা যাবে কিন্তু গান? মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠে বাংলায় রবীন্দ্র সংগীত এমন স্মরণীয় ঘটনা লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেবার সুযোগ পেয়েও আমি হারালাম। পরদিন কোন রকমে বিশ্ব ভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কাজ শেষ করে কোলকাতায় ফিরছি। বোলপুর স্টেশনে দেখা হলো শুভলক্ষ্মী দেবী ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে। একই ট্রেনে ওরাও কোলকাতায় ফিরছেন। সুযোগ পেয়ে একই বগিতে উঠে পাশাপাশি বসলাম। ট্রেন চলতে শুরু করলো। গল্প করার এক ফাঁকে তাঁকে অনুরোধ করলাম একটি গান শোনাবার জন্য। চমকে উঠে একমুখ হাসি নিয়ে তিনি বললেন, "এইখানে?" তাঁর হাসিতে প্রশ্রয় পেয়ে খানিকটা মরিয়াভাবে বললাম, "আমরা আপনার গান শুনবোই।" দাবি তো জানালাম। কিন্তু আমার নিজেরও যথেষ্ট আশংকা ছিল। চারিদিকে হকারদের চীৎকার–স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামার গোলমাল আর তার মাঝে ট্রেন চলার একটানা খটাখট আওয়াজ। এমন পরিবেশে শিল্পী গান গাইতে রাজি হলেও ট্রেনের যাত্রীরা এটাকে কিভাবে নেবেন? শেষকালে ট্রেনের কামরায় একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে না তো? শুভলক্ষ্মী দেবী কিন্তু ততক্ষণে গুনগুন করে সুর ভাজতে শুরু করেছেন। তাড়াতাড়ি টেপ রেকর্ডার বের করে চালিয়ে দিলাম। অবাক কাণ্ড! শিল্পীর সুরেলা কণ্ঠের যাদুতে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কামরা একেবারে চুপ! একটার পর একটা রবীন্দ্র সংগীত সেদিন শিল্পী আপন মনেই সারাটা পথ গেয়ে চলেছিলেন। খালি গলায় তাঁর ঐ মিষ্টি কণ্ঠ অদ্ভুত এক পরিবেশ রচনা করেছিল। চলমান ট্রেনের অবিরাম খটাখট্ আওয়াজটাও যেন সেদিন গানের পেছনে এক অপূর্ব ছন্দ রচনা করে চলেছিল। এখন ভাবি কেমন করে এত বড় শিল্পী ঐ পরিবেশে এত সহজে আমাদের অনুরোধ মেনে নিলেন? কেমন করেই বা গাইলেন গানের পর গান? হয়তোবা একেই বলে স্থান মাহাত্ম্য! রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন হয়তো বা এমনিভাবে মানুষের মনকে উদাস করে দেয়–খসে পড়ে আমাদের তথাকথিত সভ্য জীবনের সব কৃত্রিমতা। আর শুভলক্ষ্মী দেবী তো জাত শিল্পী!

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আকাশবাণীর বিশেষ করে কলকাতা কেন্দ্রের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। নির্যাতিত নিপীড়িত বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে একদিন আমরা আবিষ্কার করলাম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ওপার বাংলার সংগ্রামী ভাইবোনদের সঙ্গে আমরাও একজন সৈনিক হয়ে লড়াই করছি। কিন্তু আমাদের লড়াইটা ছিল রণক্ষেত্রে নয় বেতারের মাধ্যমে। ৭০-৭১ সালে প্রায় এক বছর ব্যাপী এই যুদ্ধে আমরা এমনভাবে একাত্ম হয়ে পড়েছিলাম যে আমরা অনেকেই এই সময় সাপ্তাহিক ছুটি নেবার সুযোগও

www.pathagar.com

পাইনি। মনে পড়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তখনকার জনসংযোগ আধিকারিক শ্রদ্ধেয় সমর বসু একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন-কি হে! বাংলাদেশের যুদ্ধ তো তোমরা ত্রিমূর্তিই জিতিয়ে দেবে। ত্রিমূর্তি বলতে সমরদা বোঝাতে চাইছিলেন আমি, সহকর্মী প্রণবেশ সেন যিনি সংবাদ পরিক্রমা লিখতেন আর দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যার অসাধারণ কণ্ঠ আর বাচনভঙ্গী দিয়ে আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরতেন। অবশ্য সংবাদ বিভাগে আরো অনেক একনিষ্ঠ কর্মী তখন একইভাবে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট বেতার সাংবাদিক নির্মল সেনগুপ্ত, সংবাদ পাঠক তরুণ চক্রবর্তী ও গৌতম বসু এবং আমাদের তখনকার বার্তা সম্পাদক দীনেশ ভৌমিক যিনি পরবর্তী সময়ে আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আসলে, সবার মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিনের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পেরেছিলাম। স্মরণীয় সংগ্রামের অনেক চরিত্র, অনেক ঘটনা, অনেক মুহূর্ত আজও আমাকে আবেগে উত্তেজনায় সময় সময় উদ্বেল করে তোলে।

মনে পড়ে সেই গানটির কথা-"শোন, একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি"। গানটি যিনি গেয়েছিলেন সেই শিল্পী অংশুমান রায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐ গানটি চিরদিন ইতিহাস হয়ে থাকবে। এই গানটির ইতিহাস হবার পেছনেও আর একটি ইতিহাস রয়েছে। সংবাদ পাঠক দেব দুলালের বাড়িতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী কামরুল হাসান এসেছেন। খবর পেয়েই সেখানে টেপরেকর্ডার নিয়ে ছুটলাম। সেখানে গৌরী প্রসন্ন মজুমদার আর আমাদের শিল্পীবন্ধু অংশুমান রায় এবং দীনেন্দ্র চৌধুরী। কামরুল হাসানের সাক্ষাৎকার রেকর্ডিং এর পর আংশুমান গৌরীদার লেখা ঐ গানটি কামরুল হাসানকে শোনাতে চাইলো। হারমোনিয়াম যা করে হোক একটি জোগাড় হলো কিন্তু তবলা? অগত্যা দীনেশ একটি খাতা টেনে নিয়ে তার ওপরেই তবলার কাজ চালাতে লাগলো। যেহেতু বাংলাদেশ নিয়েই গানটি লেখা আমিও তাই গানটি টেপে তুলে নিলাম। কারণ, আমরা এখন বাংলাদেশকে নিয়ে যা কিছু হতো তাই রেকর্ড করে প্রচার করতে বিশেষ তৎপর ছিলাম। স্টুডিওতে ফিরে এসে শুনলাম আগের দিন ঢাকায় বঙ্গবন্ধু মুজিবের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ আমাদের স্টুডিওতে রেকর্ড করা হয়েছে। ভাষণটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সংবাদ বিচিত্রায় তার কিছু অংশ প্রচার করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আমি কিন্তু ভাষণটি তখনও শুনিনি। স্বভাবতই মনটা দমে গেল। এতক্ষণ মনে মনে ছক কষছিলাম কামরুল হাসানের সাক্ষাৎকার আর অংশুমানের গান দিয়ে কিভাবে অনুষ্ঠান করা যায়। যাই হোক্ মুজিবের ভাষণটি শুনে দেখলাম বঙ্গবন্ধু জ্বালাময়ী ভাষায় বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানের একের পর বৈষম্যমূলক আচরণ আর পাক-বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেছেন। আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশের মানুষকে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। মুজিবের সেদিনের সেই তেজোদৃপ্ত ঘোষণা আজও আমাকে উদ্দীপ্ত করে।

www.pathagar.com

"এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।" সংঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম অংশুমানের গানের কিছু অংশ আর তার সংঙ্গে মুজিবের ভাষণের কিছু নির্বাচিত অংশ এমনি ভাবে পরপর গান আর ভাষণ দিয়ে সাজানো হলো সেদিনের 'সংবাদ বিচিত্রা'। সেদিন গান আর ভাষণ দিয়েই তৈরি হলো যে অনুষ্ঠান তা এবার বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। অসংখ্য শ্রোতার দাবী ছিল অনুষ্ঠানটি বারে বারে প্রচারের জন্য। আমরা শ্রোতাদের সেই দাবী মেনে নিয়েছিলাম।

এই প্রসঙ্গে, আমার আরো একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। এই 'সংবাদ বিচিত্রা' সেদিন প্রথম প্রচারিত হয়, তার পরের দিন স্বভাবতই খুশীমনে অফিসে পৌঁছেছি। সবার মুখে বঙ্গবন্ধুর সেই উদ্দীপ্ত ভাষণ আর অংশুমানের আবেগ ভরা সেই গানেরই আলোচনা। নীচে স্টুডিওতে ঢুকতেই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে তখনকার অধিকর্তা দিলীপ কুমার সেনগুপ্তের মুখোমুখি হলাম। কিন্তু আমাকে অবাক করে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আমাকে বললেন "কাল তুমি করেছ কি? তোমাকে আমি মেমো দেব।" আমি তো হতবাক্! কি অপরাধ করে ফেললাম এর মধ্যে? কয়েকটি মুহূর্তমাত্র হঠাৎ জড়িয়ে ধরে দিলীপ বাবু আমায় বললেন, উপেন, কাল তুমি আমায় কাঁদিয়েছ। বিশ্বাস করো তোমার সংবাদ বিচিত্রা শুনে কাল আমি কেঁদেছি। শুধু খারাপ কাজের জন্যই নয় ভাল কাজের জন্যও মেমো খেতে হয়। সেদিনের সংবাদ বিচিত্রার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই আমায় মেমো পাঠিয়েছিলেন তবে তিরস্কারের নয় প্রসংশার। প্রসঙ্গতঃ বলি, আমাদের তখনকার কেন্দ্র অধিকর্তা দিলীপ কুমার সেনগুপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের মতোই একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রযোজিত সে সময়ের 'রেডিও কার্টুন' অনুষ্ঠানটির কথা নিশ্চয়ই এখনও অনেকের মনে আছে।

'শোন, একটি মুজিবরের কণ্ঠে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি'–গানটি সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যায়। সেই সময় প্রতিদিনই একাধিক অনুষ্ঠানে অংশুমানের ডাক আসতে লাগলো, আর শ্রোতাদের দাবি মতো তাঁকে প্রতিটি অনুষ্ঠানে এই গানটি গাইতেই হোত। অংশুমান একদিন আমায় অনুযোগ করে বলেছিল, তুমি আমায় কি করে দিলে বলতো? আমি কি আর অন্য কোন গান জানি না? যেখানেই যাই সেই এক দাবি 'শোন একটি মুজিব আর শোন একটি মুজিব' ভালো লাগে এক গান গাইতে? পরে ওর গাওয়া এই গানের ক্যাসেটও অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। আজ আর অংশুমান নেই কিন্তু তার ঐ গানের মধ্য দিয়ে চিরদিন সে অমর হয়ে থাকবে। পরে আমার কোন কোন শিল্পী বন্ধু অভিমান করে বলেছেন, "তুমি অংশুমানকে এভাবে তুলে ধরলে অথচ আমার জন্যে কিছুই করলে না?" আসলে তাঁরা বুঝতেই চান না এভাবে কেউ কাউকে তুলে ধরতে পারেনা। গানের ঐ ভাষা, ঐ মন মাতানো সুর আর দরদী কণ্ঠ বঙ্গবন্ধুর সেই রক্তগরম করা ভাষণ আর সর্বোপরি দুই বাংলার মানুষের আবেগ আর উত্তেজনায় ভরা সে সময়ের পরিবেশ এই সবকিছু মিলিয়ে ঐ অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের মনকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

একদিন পলাশীর আম্রকুঞ্জে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। সেই আম্রকুঞ্জ থেকে কিছু দক্ষিণে সীমান্তের ওপারে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর গ্রামে আর এক আম্রকাননে জন্ম নিল আনুষ্ঠানিকভাবে আর এক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। আগের দিন সন্ধ্যায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তখনকার জনসংযোগ আধিকারিক শ্রদ্ধেয় সমর বসু আমাদের জানালেন পরদিন ভোরে জরুরী কোন কভারেজে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। আমরা যেন নির্দিষ্ট সময়ে প্রেস ক্লাবে হাজির থাকি। যথাসময়ে টেপ রেকর্ডার নিয়ে হাজির হলাম। কোথায় যাবো, কেনই বা যাচ্ছি সমরদা তো কিছুই বলেন নি। সাংবাদিক দলকে নিয়ে যখন গাড়ি ছাড়ল–তখন জিজ্ঞেস করতেই সেই মৃদু ধমক- "চলই না বাবা বেড়িয়েই না হয় ফিরবে"। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিদিন তখন নানা নাটকীয় ঘটনা। প্রতি মুহূর্তেই টান্ টান্ উত্তেজনা। বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে সারা বিশ্ব তখন আলোড়িত। এমনি টাল মাটাল অবস্থায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সাংবাদিকদের নিয়ে ছুটছে অজানা এক ঠিকানার উদ্দেশ্যে। আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম বিরাট কিছু খবর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা যত উত্তেজনায় ছটফট করছি ততটাই নির্বিকার সমরদা। সেই নির্লিপ্ত কণ্ঠের একই জবাব "চলোই না জায়গায় গেলে তো দেখতেই পাবে"। অবশেষে পৌঁছলাম সেই মেহেরপুরে। একটি অচেনা গ্রাম। নাম দেয়া হয়েছে 'মুজিবনগর'। তৈরি হয়েছে ছোট একটি সভামঞ্চ। সেখানে ভিড় করেছেন আশপাশের অনেক গ্রামের অসংখ্য মানুষ। প্রচন্ড তাঁদের উৎসাহ আর উদ্দীপনা। কিন্তু সবার মধ্যে রয়েছে চাপা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। মনে পড়ছে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। গানটি দিয়ে শুরু হলো সভার কাজ। মঞ্চ থেকে এরপর ঘোষণা করা হোল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে একে একে শপথ গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগণ। প্রতিটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে সমবেত জনতা উল্লসিত হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন তা দেখেই আমাদের মনে হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। ছোট্ট অনুষ্ঠান একেবারেই অনাড়ম্বর। কিন্তু সেদিনের জনগণের উন্মাদনা আজও আমাকে শিহরিত করে। সমরদার নীরবতার কারণ অবশ্য অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছেই বুঝি। কারণ তখনও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি।

পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর শুরু হলো শাসকদের অমানুষিক অত্যাচার। এক সময়ে পাক হানাদার বাহিনী হঠাৎ কামান, রাইফেল, রকেট, মর্টার প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় মানুষগুলোর ওপর। লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা হত্যা করল, লুণ্ঠিত হলো অগণিত মা বোনদের ইজ্জত। শয়তান পাক-বাহিনীর নারকীয় অত্যাচারে বিপন্ন মানুষ সবকিছু হারিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে দলে দলে চলে এলো ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এক লক্ষ নয় দুই বা দশ

www.pathagar.com

লক্ষ নয় প্রায় এক কোটি বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষকে সে সময় আশ্রয় দিয়েছিল ভারত। সল্টলেক এবং সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হয়েছিল হাজার হাজার ত্রাণ শিবির। একমাস-দু'মাস নয় এক বছরেরও বেশী সময় ধরে এই এক কোটি উদ্বাস্তুকে খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় আর চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিল ভারত।

পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন ভাল ছিলনা। নকশাল এবং অন্যান্য আন্দোলনে রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল টালমাটাল। অথচ এই অবস্থায় পশ্চিমবাংলার মানুষ কিন্তু জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবকিছু ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে এসেছিলেন ওপারের অসহায় মানুষগুলোর সাহায্যে। সেদিন সাধারণ মানুষের এমন অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব ছিল না এই বিরাট সমস্যা মোকাবেলা করার।

বাংলাদেশের অত্যাচারিত মানুষের হাহাকার প্রথমদিকে তেমনভাবে বিশ্বকে আলোড়িত না করলেও পাক-বাহিনীর ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা নারকীয় অত্যাচারের বীভৎসতা ধীরে ধীরে অনেকের বিবেককেই দংশন করেছিল। বাধ্য হয়ে পরে অনেকেই ছুটে এসেছিলেন বাস্তুহারাদের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে। এ সময়ের অনেক বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথাই মনে পড়ে। আমি মাত্র দুটি ছোট ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করবো।

সল্টলেকে উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে এসেছেন আমেরিকার সিনেটর রবার্ট কেনেডি। রবার্ট কেনেডি ছিলেন রাষ্ট্রপতি কেনেডির ভাই। আমি যথারীতি টেপ রেকর্ডার নিয়ে তার সঙ্গে ঘুরছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষের অসহায় অবস্থা দেখে স্বজন হারানো মানুষগুলোর আকুল কান্নায়-দৃশ্যতই বিচলিত হয়ে উঠলেন রবার্ট কেনেডি। এক সময় যেন স্বগতোক্তির মতই বলে উঠলেন, "President should have come here and see for himself what is happening here!" ঘটনাটি এখনও মনে আছে এই জন্যে যে এটি আমার পেশাগত জীবনে এক নিদারুণ ব্যর্থতা। বিপন্ন মানুষগুলোর ভিড়ে সিনেটরের পাশে সেই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মধ্যে একমাত্র আমি উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আমি সিনেটরের স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত এই স্বগতোক্তিকে সেদিন আমার টেপরেকর্ডারে ধরে রাখতে পারিনি। আমি ভাবতে পারিনি হঠাৎ তিনি এভাবে ঐ কথাগুলি বলবেন। হয়তো তিনিও ভেবে বলেননি। মানুষের কান্নায় বিচলিত হয়েই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মন্তব্যটি। আজও আমার কষ্ট হয় আর একটু সচেতন হলে হয়তো টেপরেকর্ডার চালাতে ব্যর্থ হতাম না সেদিন।

আর একটি ঘটনা। ব্রিটেন থেকে ৪/৫ জনের এক সংসদীয় দল এসেছেন ভারতে উদ্বাস্তু শিবিরগুলির সত্যিকারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। ভারতে আসার আগে তাঁরা পাকিস্তানের শিবিরগুলি দেখে এসেছেন। সে সময় পাকিস্তানও প্রচার চালাচ্ছিল যে ভারত থেকেও লক্ষ লক্ষ মুসলমান আক্রান্ত হয়ে ওপারের ত্রাণ শিবিরে

www.pathagar.com

আশ্রয় নিয়েছে। বনগাঁ সীমান্তে ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে যাবার আগে তাঁরা বললেন যে তাঁদের সঙ্গে কোন সাংবাদিককে যেতে অনুমতি দেবেন না। শিবির পরিদর্শন করে এসেই সাংবাদিকদের যা বলার বলবেন। আমি শুধু অনুরোধ জানিয়ে আকাশবাণীর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের সঙ্গে যাবার অনুমতি পেলাম। কারণ উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তাও আমার রেকর্ড করা প্রয়োজন। কিন্তু সংসদীয় দলের নেতা ফিরে এসেই আমার সঙ্গে কথা বলবেন তার আগে নয়। শিবির পরিদর্শনের কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি লক্ষ্য করলাম প্রতিনিধি দলের সবাই উদ্বাস্তুদের মর্মান্তিক বর্ণনায় বিচলিত। অসংখ্য মানুষ তাঁদের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন–কেউবা আবার কাঁদতে কাঁদতেই পাক-বাহিনীর সেই নিদারুণ অত্যাচারের কাহিনী শোনাচ্ছেন। মুস্কিল হলো প্রতিনিধি দলের সংঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে প্রতিনিধি ছিলেন তিনি বাংলাদেশের গ্রামের পূর্ববঙ্গীয় ভাষা তেমন বুঝতে পারছিলেন না–আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চার পাঁচ জন প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাব দেয়া তার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে, এক সময় দেখা গেল আমি সেই ব্রিটিশ সংসদীয় দলনেতার দোভাষীর কাজ করছি অর্থাৎ উদ্বাস্তুদের কথাগুলো যথাসম্ভব ইংরেজি তর্জমা করে তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। আমার বাড়তি সুবিধা ছিল আমি পূর্ববাংলারই ছেলে কাজেই পূর্ব বঙ্গীয় ভাষা আমার জানা। দোভাষীর কাজ করলেও এবার কিন্তু আমি আমার টেপরেকর্ডার চালাতে ভুল করিনি। একসময় দেখলাম সেই নেতা স্বগতোক্তির মতোই বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, "Impossible! Inhuman it is a genocide." এমনি আরো অনেক মন্তব্য। সুযোগ বুঝে তার সামনে মাইক ধরে আমার মোক্ষম প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিই, "এখানকার শিবির পরিদর্শনের আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাই।" দ্বিধাহীন কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "অকল্পনীয়–সহ্য করা যায় না। এভাবে সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করা যায় না।" তিনি আরো বলেন,"পাক বাহিনীর নিদারুণ অত্যাচারের সাক্ষী এই লক্ষ লক্ষ মানুষের অবস্থা দেখে সত্যি আমরা স্তম্ভিত।" সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা প্রশ্ন করি–"আর সীমান্তের ওপারে ত্রাণ শিবির গুলিতে আপনারা কি দেখে এলেন?" বিরক্তভাবেই সেদিন জবাব দিয়েছিলেন তিনি– "A few stray dogs! Nothing else!" অর্থাৎ পাক বেতারে এতদিন যে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছিল যে ওপারের ত্রাণ শিবিরগুলিও এপার থেকে যাওয়া উদ্বাস্তুদের ভিড়ে পরিপূর্ণ বৃটিশ সংসদীয় দলের এই খোলাখুলি স্বীকারোক্তি মাঠে হাঁড়ি ভেঙে দিল–তাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। তারা বলে গেলেন ওপারে কয়েকটি মাত্র শিবির দেখা গেছে। আর সেখানে গুটিকয়েক রাস্তার কুকুর ছাড়া আর কিছুই তাঁরা দেখতে পাননি। বৃটিশ সংসদীয় দলনেতার এই সাক্ষাৎকারটি সে সময় আমাদের বিদেশী প্রচার তরঙ্গেও বারে বারে প্রচার করা হয়েছিল এবং সত্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। প্রসঙ্গত বলি, পরে যখন ঐ দলনেতা সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তখন কিন্তু এমন খোলামেলাভাবে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি। অনেক

www.pathagar.com

রেখেঢেকে কথা বলছিলো। আসলে, বিশেষ মুহূর্তে যে কোন মানুষের সত্যিকারের চিন্তা-ভাবনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে। মাইক হাতে আমার লক্ষ্যই থাকত মানুষের ঐ দুর্বল মুহূর্তটিকে ধরে রাখা।

মেহেরপুরে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের পরের দিনই কোলকাতার তখনকার পাকিস্তানি ডেপুটি হাই কমিশনার মিঃ হোসেন আলী সদ্যঘোষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। ছুটলাম টেপরেকর্ডার নিয়ে বাংলাদেশ মিশনে। মিঃ হোসেন আলীর সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতেই শুনছিলাম–পাশের ঘরে বেগম আলীর আবেগ আর উত্তেজনায় ভরা কণ্ঠস্বর। মিঃ হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ হতেই অনুরোধ জানালাম মিসেস হোসেন আলীর একটি সাক্ষাৎকারের জন্য। কোনরকম দ্বিধা না করেই মিসেস হোসেন আলী বলতে রাজি হলেন। পাক-বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবের বর্ণনা দিতে গিয়ে তখন তিনি আবেগ আর উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। আমার মনে পড়ছে সাক্ষাৎকারটি শেষ করেছিলেন এই কটি কথা দিয়ে–"তাই আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না বাংলাদেশকে স্বাধীন কইর‍্যা দিলাম। উড়াইয়া দিলাম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।" কথা কয়টি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। কারণ, স্টুডিওতে এসে অনেকবার আমাদের লাইন দু'টি শুনতে হয়েছিল। আমরা দ্বিধায় ছিলাম কথাটা বেতারে প্রচার করা ঠিক হবে কি না? আসলে, মিসেস আলী তো আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন না আর তিনি বাংলাদেশ মিশনে জাতীয় পতাকাও উড়াতে পারেন না। পারেন তার স্বামী মিঃ হোসেন আলী। কিন্তু মুশকিল হলো যেভাবে উনি অত্যাচারের বীভৎস চিত্র তুলে ধরে ঘোষণাটি করেছিলেন সেখানে কাঁচি চালানো সম্ভব ছিল না। আমাদের মনে হয়েছিল মিসেস আলী "আমি" বলতে সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিনিধি হয়েই বলেছিলেন। আর শ্রোতাদের মিসেস আলীর আসল বক্তব্যটি বুঝতে অসুবিধা হবে না। তাই আমরা সেদিন কোনরকম কাটছাট না করেই ঐ সাক্ষাৎকারটি আকাশবাণীর নানা তরঙ্গে বারে বারে প্রচার করেছিলাম। অসুবিধা হয়ওনি। কারণ, বহু শ্রোতা মিসেস আলীর আবেগ জড়িত কণ্ঠের এই সাক্ষাৎকারটির জন্য প্রশংসা করেছিলেন।

কয়েকদিন পরের বাংলাদেশ মিশনেরই আর একটি ঘটনা। মিসেস হোসেন আলী আমায় ফোন করে বললেন–"শীগ্‌গীর টেপরেকর্ডার নিয়্যা আমাদের এখানে আসেন।" ছুটলাম সেখানে। পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে দেখি মিসেস আলী ১০/১২ বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। যেতেই বললেন–"পাকিস্তানি শয়তানদের অত্যাচারের আর একটি শিকার।" আমি টেপরেকর্ডার বের করতেই আতঙ্কিত হয়ে মিসেস আলীকে জড়িয়ে ধরে বললো, "ওটা কি?" মিসেস আলী ওকে বুঝিয়ে বললো। আমিও নানা কথায় ওর আপন হবার চেষ্টা করলাম। কিছুটা স্বাভাবিক হলে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে ওর নাম জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করলাম। ধীরে ধীরে উত্তর দিল "আয়েশা"। প্রশ্ন করলাম, "বাংলাদেশে কি হয়েছিল বলো আমায়।" এবার আতঙ্ক আর ভয়ে সরে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে ওকে বুঝিয়ে বললাম, "তোমার আর ভয় নেই। তুমি আমাদের দেশে এসেছো। এখানে তোমাকে ওরা কিছু করতে পারবে না। ওরা এখানে আসবে কি করে?" আবার স্বাভাবিক হয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো। কিভাবে ওর চোখের সামনেই ওর বাবা, মা আর সবক'টি ভাই-বোনকে শয়তানরা কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। কিভাবে ওর ছোট্ট বোনের রক্তে সারা উঠোন ভেসে গেল। এখানেই শেষ নয়। ছুরি দিয়ে কুপিয়ে কিভাবে সেই জায়গায় শুকনো লঙ্কার গুড়ো আর নুন ছিটিয়ে দিয়েছিল ওরা। বলতে বলতে আয়েশা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লো। কিছুটা সুস্থ হলে আবার জিজ্ঞেস করি, "তুমি এখানে এলে কিভাবে?" উত্তরে ও জানাল কিভাবে পালিয়ে বাড়ির পাশেই পুকুরে কচুরিপানার মধ্যে শুধু নাকটুকু ভাসিয়ে রেখে সারাদিন লুকিয়ে ছিল। তারপর রাতের অন্ধকারে ভয়ে আর আতঙ্কে ছুটতে শুরু করেছিল। বলতে বলতে উদভ্রান্তের মতো এক সময় কান্নায় ভেঙে পড়লো। কান্না কিছুটা থামলে প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য প্রশ্ন করলাম, "তুমি গান জানো?" সঙ্গে সঙ্গে "হ্যাঁ" বলে আয়েশা গাইতে শুরু করলো, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" দু'এক কলি গাইবার পরই ওর গলা ধরে এলো। কান্নাভেজা কণ্ঠে গান থামিয়ে বললো, "আমি আর পারছি না।" টেপরেকর্ডার বন্ধ করে স্টুডিওতে ফিরে এলাম।

জানি না কোন বিদেশী বাহিনীকে এভাবে স্বাগত জানাবার নজীর ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে কি না? মনে পড়ছে সেই দিনটির কথা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। বিকেল তখন ৪-২০ মিনিট। ঢাকায় বুড়িগঙ্গার তীরে সূর্য তখন অস্ত যেতে বসেছে। রেসকোর্স ময়দানে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ। অবশ্য তার আগে বেশকিছু সময়ের রুদ্ধশ্বাস নাটক। জল স্থল আর আকাশ পথে ঘিরে ফেলেছে পাকবাহিনীকে। বেতারে বারে বারে ঘোষিত হচ্ছে চরম বার্তা। অবশ্যই পাক বাহিনীর উদ্দেশ্যে। "হয় আত্মসমর্পণ করো নয়তো চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত হও! তোমাদের পালাবার কোন পথ নেই।" কোন উপায় নাই দেখে শেষ পর্যন্ত হানাদার বাহিনী মাথা নীচু করে এগিয়ে এল পরাজয় স্বীকার করে। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করলেন পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে। মনে পড়ছে সেই স্মরণীয় দৃশ্য! একদিকে পরাজিত পাক বাহিনীর সৈনিকেরা একে একে এসে যখন নত মস্তকে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করছে তখন অপরদিকে গর্বিত ভারতীয় বাহিনীর সেনাদের নিয়ে ঢাকার রাজপথে জনতার সে কি উল্লাস! সমবেত জনতার উচ্ছ্বাস আর অভিনন্দনের বন্যায় ভেসে গেলেন সেদিন আমাদের সেনাপতি জেনারেল অরোরা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। ঘরে ফিরে গেছেন সে দেশের গৃহত্যাগী মানুষ। ফিরে পেয়েছেন অনেকে তাঁদের ভিটেমাটি। ফিরে পেয়েছেন তাঁদের অনেকে আত্মীয়-পরিজন। নতুন করে দেশকে গড়ে তুলবার কাজে ব্রতী আজ সেখানকার মানুষ।

আমার কিন্তু বারে বারে মনে হয়, কি হলো সেই আয়েশার? সে কি ফিরে যেতে পেরেছে স্বদেশে? ফিরে পেয়েছে সে কোন আপনজন? সে কি আজ নতুন করে ঘর বাঁধতে পেরেছে নাকি হারিয়ে গেছে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত?

যে যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের কোন প্রশ্নই ছিল না; এক কোটি বিপন্ন মানুষের বিরাট বোঝা চাপিয়ে সেই যুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা হলো। এটাই ছিল ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের একটি অঘোষিত যুদ্ধ। কোন উপায় ছিল না বলেই শেষ পর্যন্ত ভারতকে বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গঠিত হলো ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশ মুক্তি-বাহিনীর সম্মিলিত ফৌজ।

মনে পড়ে, যেদিন যশোরের পতন ঘটল। বাংলাদেশে যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলেছে। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে সম্মিলিত বাহিনী। জলে, স্থলে, আকাশে ভারতীয় বাহিনীর অপ্রতিহত গতি। যশোরের যেদিন পতন হলো, সেদিন আমি ছিলাম সেখানে। ভারতীয় বাহিনীকে স্বাগত জানাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সেদিন কি উল্লাস আর আনন্দ! আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই আজ পথে নেমে এসেছে। মুক্তির আনন্দে প্লাবিত মানুষগুলোর উন্মাদনা আর উচ্ছ্বাসের অসাধারণ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আজ ভাবি চেঙ্গিস খানকেও লজ্জা দেওয়া পাক-বাহিনীর অত্যাচার আর বর্বরতার কাহিনী ভারতীয় জনগণকে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মানুষকে কত গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল সেদিন। মানবিকতা–যার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত রেখে এদেশের প্রতিটি মানুষ এমনকি দেশ বিভাগের ফলে একদিন যারা সর্বস্ব হারিয়ে শরণার্থী হয়ে এসেছিলেন এদেশে তাঁরাও ঝাঁপিয়ে পড়লেন নয়া শরণার্থীদের পুনর্বাসনে। রাজনৈতিক অথবা ভাষা ও ধর্মগত সমস্ত ভেদাভেদ, সব ব্যবধান ধুয়েমুছে একাকার হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার আবেদন তো সেদিন তেমনভাবে প্রচার করতে হয়নি জনগণের কাছে। আয়োজন করতে হয়নি কোন মিছিল অথবা আলোচনাচক্রের। কোন্ অদৃশ্য যাদু বলে আমরা সেদিন সমস্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণের সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করে মানবিকতার জয়পতাকাকে তুলে ধরতে পেরেছিলাম? সগর্বে ঘোষণা করতে পেরেছিলাম আমরা সবাই মানুষ–মনুষ্যত্বই আমাদের একমাত্র পরিচয়।

www.pathagar.com

উপসংহার

দীর্ঘ চল্লিশ বছর বেতার ও দূরদর্শনে কাজ করে বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছি। নানা ঘটনার সাক্ষী হয়ে অনেক মানুষের সান্নিধ্যে এসে বেতার সাংবাদিকের কর্মজীবনকে আমি ভালোভাবেই উপভোগ করেছি। বৈচিত্র্যময় সেই কর্মকাণ্ডের অনেক মুহূর্তই উত্তেজনা আর রোমাঞ্চে ভরা। আজ বারে বারে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়—সেই কর্মচঞ্চল জীবনে।

আগেই বলেছি অনেক কিছুই আজ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। আবার অনেক ছবিই আমার কাছে ঝাপসা হয়ে আসছে। তবু মাঝে মাঝে ফিরে আসে বাংলাদেশের সেই ছোট্ট মেয়ে 'আয়েশা'—ছোট্ট বেলায় হারিয়ে যাওয়া সেই 'জ্যোৎস্না'। ভুলতে পারি না ইডেনের দুর্ঘটনায় সদ্য পুত্রহারা বৃদ্ধ পিতার সেই বুকফাটা আর্তনাদ!

কেন জানি না—জানতে ইচ্ছে করে আয়েশা কেমন আছে? আবার ভেসে যায়নি তো সে? জ্যোৎস্নাই বা এখন কোথায়? সে কি আজ সুখে ঘর-সংসার করছে না কি আবার হারিয়ে গেছে চলার পথে? পুত্রহারা পিতার কান্না কি থেমেছে—নাকি এখনও তিনি তেমনিভাবে কেঁদে চলেছেন? কে দেবে আমার এইসব এলোমেলো প্রশ্নের উত্তর? জানি এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো আজ কেউ দিতে পারবে না। তবু ওরা আমার মাথায় ভিড় করে—মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাই স্মৃতি আমার কাছে আজ শুধু বেদনা!

www.pathagar.com

বাংলা ছায়াছবির স্বনামধন্যা নায়িকা সুচিত্রা সেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন লেখক।

বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে।

www.pathagar.com

মহানায়ক উত্তম কুমারের সঙ্গে লেখক।

ফুটবল সম্রাট পেলের সঙ্গে ।

www.pathagar.com

ভারত ও বাংলাদেশের সম্মিলিত ফৌজ যশোর দখল করে- এগিয়ে চলছে। রাস্তার দু'পাশে উল্লসিত জনতা তাদের অভিবাদন জানাচ্ছেন।

বাংলাদেশের যুদ্ধে অগ্রবর্তী বাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ও লেখক। যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বশেষ পরিস্থিতি টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখেছেন (Spot Comentary) 'সংবাদ বিচিত্রা'র জন্য।

www.pathagar.com

যশোর মুক্ত হওয়ার পর ভারতীয় ফৌজ ও মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা এগিয়ে চলেছেন। পথ-নির্দেশিকার পাশে টেপ রেকর্ডার নিয়ে লেখক।

যশোর দখল নেবার পরেই সন্মিলিত বাহিনীর অফিসারদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন লেখক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN-984-8245-47-2